ষষ্ঠ মুদ্রণ :
ফাল্গুন, ১৩৬৪

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীবঙ্কিমবিহারী রায়
অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭/এ বলাই সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট :
শ্রীকানাই পাল

নারীর মূল্য

মণি-মাণিক্য মহামূল্য বস্তু, কেন-না তাহা দুষ্প্রাপ্য। এই হিসাবে নারীর মূল্য বেশী নয়, কারণ সংসারে ইনি দুষ্প্রাপ্য নহেন। জল জিনিসটি নিত্য প্রয়োজনীয়, অথচ ইহার দাম নাই। কিন্তু যদি কখনও ঐটির একান্ত অভাব হয়, তখন রাজাধিরাজও বোধ করি একফোঁটার জন্য মুকুটের শ্রেষ্ঠ রত্নটি খুলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করেন না। তেমনি—ঈশ্বর না করুন,—যদি কোনদিন সংসারে নারী বিরল হইয়া উঠেন, সেইদিনই ইহার যথার্থ মূল্য কত, সে তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে—আজ নহে। আজ ইনি সুলভ।

কিন্তু দাম যাচাই করিবারও একটা পথ পাওয়া গেল। অর্থাৎ পুরুষের কাছে নারী কখন, কি অবস্থায়, কোন্ সম্পর্কে কতখানি প্রয়োজনীয়, তাহা স্থির করিতে পারিলে—নগদ আদায় হৌক, আর না হৌক, অন্ততঃ কাগজে-কলমে হিসাব-নিকাশ করিয়া ভবিষ্যতে একটা নালিশ-মকদ্দমারও দুরাশা পোষণ করিতে পারা যায়। একটা উদাহরণ দিয়া বলি। সাধারণতঃ বাটীর মধ্যে বিধবা ভগিনীর অপেক্ষা স্ত্রীর প্রয়োজন অধিক বলিয়া স্ত্রীটি বেশী দামী। আবার বিধবা ভগিনীর দাম কতকটা চড়িয়া যায়, স্ত্রীটি যখন আসন্ন-প্রসবা—যখন রাঁধা-বাড়ার লোকাভাব, যখন কচি ছেলেটাকে কাক দেখাইয়া বক দেখাইয়া দুধটা খাওয়ানো চাই। তাহা হইলে পাওয়া যাইতেছে—নারী ভগিনী-সম্পর্কে বিধবা অবস্থায়, নারী ভার্যা-সম্পর্কীয়ার অপেক্ষা অল্প মূল্যের। ইহা সরল স্পষ্ট কথা। ইহার বিরুদ্ধে তর্ক চলে না। একটা শ্লেট-পেন্সিল লইয়া বসিলে, নারীর বিশেষ অবস্থায় বিশেষ মূল্য বোধ করি আঁক কষিয়া কড়া-ক্রান্তি পর্যন্ত বাহির করা যায়। কিন্তু কথা যদি উঠে, ইহার অবস্থা-বিশেষের মূল্য না হয় এক রকম বোঝা গেল, কিন্তু নারীত্বের সাধারণ মূল্য ধার্য্য করিবে কি করিয়া, যখন ইহার জন্য সোনার লঙ্কা নিপাত হইয়াছিল, ট্রয়-রাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল;

আরও ছোট-বড় কত রাজ্য হয়ত ইতিপূর্বে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইতিহাস সে-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। এখানে এতবড় প্রয়োজন নারীতে কি ছিল যে, সাম্রাজ্য ভাসাইয়া দিতেও মানুষ পরাঙ্মুখ হয় নাই, প্রাণ দিতেও দ্বিধা করে নাই। তোমার শ্লেটখানিতে জায়গা কত যে, ইহার দাম তুমি কষিয়া বাহির করিয়া দিবে? কথাটা বাহিরের দিক হইতে অস্বীকার করি না, কিন্তু ভিতরের দিকে চাহিয়া আমি যদি প্রশ্ন করি, মানুষ রাজ্যের দিকে চাহিয়া দেখে নাই সত্য, কিন্তু তাহা কতটা যে নারীর দিকে চাহিয়া, আর কতটা যে নিজের অসংযত উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির দিকে চাহিয়া—সে জবাব আমাকে কে দিবে?

(নারীত্বের মূল্য কি? অর্থাৎ, কি পরিমাণে তিনি সেবাপরায়ণা, স্নেহশীলা, সতী এবং দুঃখে-কষ্টে মৌনা। অর্থাৎ, তাঁহাকে লইয়া কি পরিমাণে মানুষের সুখ ও সুবিধা ঘটিবে, এবং কি পরিমাণে তিনি রূপসী। অর্থাৎ, পুরুষের লালসা ও প্রবৃত্তিকে কতটা পরিমাণে তিনি নিবদ্ধ ও তৃপ্ত রাখিতে পারিবেন। দাম কষিবার এ ছাড়া যে আর কোন পথ নাই, সে কথা আমি পৃথিবীর ইতিহাস খুলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারি)

ইয়োরোপ এ-দেশীয়কে চোখ রাঙাইয়া বলে, "তোমরা নারীর মূল্য জানো না, মর্যাদা বোঝ না, আমোদ-আহ্লাদে তাহাকে যোগ দিতে দাও না, ঘরের কোণে আবদ্ধ করিয়া রাখো—তোমরা বর্বর।" মনু প্রভৃতি হইতে 'পূজার্হা' ইত্যাদি শ্লোক তুলিয়া পাল্টা জবাব দিয়া আমরা বলি, "না, আমরা মা-বোনের মুখে রঙমাখাইয়া, শ্যাম্পেন-ক্লারেট পান করাইয়া উত্তেজিত করিয়া সভা-সমিতিতে নাচাইয়া লইয়া ফিরি না—আমরা ঘরের কোণে পূজা করি। তোমাদের ঐ বল-ডান্সের পোষাক দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হই, নাচ দেখিয়া চোখ বুজি। আমরা বরং বর্বর হইয়া চিরদিন মা-বোনকে ঘরের কোণে বদ্ধ করিয়া রাখিব, কিন্তু তাঁহাদের মর্যাদা বাড়াইবার জন্য প্রকাশ্যে ভিড়ের মধ্যে নাচাইতে পারিব না।" সাহেবেরা অবশ্য এ তিরস্কার গ্রাহ্য করে না। প্রসিদ্ধ আচার্য Prof.

Maspero সাহেব প্রাচীন মিশরে নারীর সভ্যতা-প্রসঙ্গে তাঁহার Dawn of Civilisation গ্রন্থে একস্থানে লিখিয়াছেন, মিশরীয় মহিলারা বক্ষ প্রায় অনাবৃত করিয়া রাজপথে বাহির হইতেন—সুতরাং নিশ্চয়ই তাঁহারা যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিলেন। যেহেতু "like Europeans they must have coveted public admiration." ফন্দিটা অব্যর্থ, তাহা অস্বীকার করা চলে না। নিজেদের মহিলা-সম্বন্ধে তিনি অসঙ্কোচে এ-কথা বলিয়া গেলেন, কিন্তু এই admiration কথাটার ঠিক বাঙলা তর্জমা করিতেও আমাদের লজ্জায় মাথা কাটা যায়। যাহা হৌক, আমাদের উত্তরটাও নেহাৎ মন্দ শুনাইল না। "ভিড়ের মধ্যে নাচাইতে পারিব না" এবং "ঘরের কোণে পূজা করি"। সুতরাং কথার লড়াইয়ে তখনকার মত একরকম জিতিয়া যাই এবং মনু-পরাশর মাথায় করিয়া পরস্পরের পিঠ ঠুকিয়া দিয়া ঘরে ফিরিয়া আসি। অবশ্য সাহেবদের কাছে আমি হঠিতে বলি না, কিন্তু ঘরে ফিরিয়া দুই ভায়ে যদি বলাবলি করি "ভায়া, পূজা ত করি, কিন্তু কিভাবে করি বল ত?" তখন কিন্তু এমন অনেক কথাই বাহির হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা যাহা বাহিরের লোকের কানে কিছুতেই তোলা চলে না। অতএব আমাদের এটা নিভৃত আলোচনা।

প্রথম, সতীত্বের বাড়া নারীর আর গুণ নাই। সব দেশের পুরুষই এ-কথা বোঝে, কেন না, এটা পুরুষের কাছে সবচেয়ে উপাদেয় সামগ্রী; এবং স্বামীর অবাধ্য হওয়া,—তিনি অতি পাষণ্ড হইলেও—তাঁহাকে মনে মনে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মত দোষ আর নাই। একটা অপরটার corollary; এই সতীত্ব যে নারীর কতবড় ধর্ম হওয়া উচিত, রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণাদিতে সে-কথার পুনঃ পুনঃ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এ-দেশে এ তর্ক এত অধিক হইয়াছে যে, এ-সম্বন্ধে আর বলিবার কিছু নাই। এখানে স্বয়ং ভগবান পর্যন্ত সতীত্বের দাপটে কতবার অস্থির হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু সমস্ত তর্কই একতরফা—একা নারীরই জন্য। পুরুষের এ-সম্বন্ধে যে বিশেষ কোন বাধ্য-বাধকতা

ছিল, তাহা কোথাও খুঁজিয়া মেলে না, এবং এতবড় একটা প্রাচীন দেশে পুরুষের সম্বন্ধে একটা শব্দ পর্যন্তও যে নাই, এ-কথা খুলিয়া বলিলে হাতাহাতি বাধিবে, না হইলে বলিতাম। ইংরাজ বলে, 'chastity', তবুও ইহার দ্বারা তাহারা নরনারী উভয়কেই নির্দেশ করে। কিন্তু এ-দেশে ও-কথাটার বাঙলা করিলে 'সতীত্ব' দাঁড়ায়; সেটা নিছক নারীরই জন্য। শাস্ত্রকারেরা বনে-জঙ্গলে বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সমাজ চিনিতেন। তাই একটা শব্দ তৈরী করিয়াও তাঁদের জাত-ভাইকে অর্থাৎ পুরুষকে inconvenient করিয়া যান নাই। তাহার প্রবৃত্তি নারী-সম্বন্ধে যত রকমে হাত-পা ছড়াইয়া খেলিতে পারে, তাহার জায়গা রাখিয়া গিয়াছেন। পৈশাচ বিবাহটাও বিবাহ। এমনি সহানুভূতি! এতই দয়া! আর এত দয়া না থাকিলে কি পুরুষ শাস্ত্রকারকে মানিত, না, আজ বিংশ শতাব্দীতেও বিধবা-বিবাহ উচিত কি না, জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার কাছে ছুটিয়া যাইত? কবে কোন্ যুগে যে, সব পুঁথিপত্র দরিয়ায় ভাসাইয়া দিয়া মনের মত শাস্ত্র বানাইয়া লইয়া ছাড়িত। যাহাই হৌক, নারীর জন্য সতীত্ব, পুরুষের জন্য নয়। এ সতীত্বের চরম দাঁড়াইয়াছিল সহমরণে। কবে এবং কি হইতে ইহার সূত্রপাত, সে-কথা ইতিহাস লেখে না। রামায়ণে স্বামীর মৃত্যুতে কৌশল্যা বোধ করি একবার রাগ করিয়া সহমরণে যাইবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু শেষে তাঁহার রাগ পড়িয়া গিয়াছিল—দশরথকে একাই দগ্ধ হইতে হইয়াছিল। এ গ্রন্থে এ-সম্বন্ধে আর কোন উচ্চ-বাচ্য শোনা যায় না। তাই অনুমান হয়, ব্যাপারটা লোকের জানা থাকিলেও কাজটা তেমন প্রচলিত হইয়া পড়ে নাই। মহাভারতের মাদ্রী ভিন্ন আর যে কেহ এ কাজ করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কুরুক্ষেত্রের লড়াইয়ের পর কতক কতক ঘটিয়া থাকিলেও তাহা কম। অন্ততঃ, পুরুষ যে তখনও উঠিয়া-পড়িয়া লাগে নাই, তাহা নিশ্চিত। অথচ, দেখা যায়, অসভ্য জাতির মধ্যে এ প্রথার বেশ প্রচলন।

দাক্ষিণাত্যে সতীর কীর্তিস্তম্ভ যথেষ্ট, এবং আফ্রিকায় ও ফিজি দ্বীপে ভাগ্যে কীর্তিস্তম্ভের বালাই নাই, না হইলে ও-দেশগুলায় বোধ করি এতদিনে পা ফেলিবার স্থানটুকুও থাকিত না। এক একটা ডাহোমি সর্দারের মৃত্যু-উপলক্ষে তাহার শতাবধি বিধবাকে সমাধিস্থানের আশে-পাশে গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইত—অর্থাৎ পরলোকে সঙ্গে সঙ্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইত। পরলোকের ব্যাপারটা তেমন স্পষ্ট নয়, বলা যায় কি, যদি লোকাভাবে সেখানে কষ্ট হয়। সাবধানের বিনাশ নাই, তাই সময় থাকিতে একটু হুঁসিয়ার হওয়া। আমাদের এ-দেশেও মূল কারণ বোধ করি ইহাই। যারা অশোক রাজার রাজত্ব দেখিয়াছিল, তাহারা বলে, সে-সময় বিধবাকে দগ্ধ করার প্রথাটা আর্যাবর্তে ছিল না, দাক্ষিণাত্যে ছিল। কিন্তু আর্যাবর্তের আর্যেরা যাই খবর পাইলেন, অসভ্যেরা অসভ্য হৌক, যাহাই হৌক, বড় মন্দ মতলব বাহির করে নাই—ঠিক ত! পরলোকে যদি সত্যই কিছু থাকে ত সেখানে সেবা করে কে? অমনি উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেলেন এবং এত বিধবা দগ্ধ করিলেন যে, স্পেনের ফিলিপের বোধ করি লোভ হইত।

এমনি করিয়া মহাভাগার পূজার উপকরণ সজ্জিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু একদিন যাহাকে বংশের হিতকামনায় ঘরের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনিয়াছি, যাহার জন্য হয়ত যুদ্ধ করিয়াছি, ছলনা, মিথ্যা কথা, এমন কি চুরি পর্যন্ত করিয়াছি, এমন এতবড় উপকারী জীবটাকে এখন হত্যা করি কেন? কারণ আছে। প্রথম পরলোকে সেবা করে কে, দ্বিতীয়, ভাগ্যদোষে যে স্ত্রী বিধবা হইয়া গেল, তাহার দ্বারা আর কি বিশেষ কাজ পাওয়া যাইবে? বরং ভবিষ্যতে অশান্তি-উপদ্রবের সম্ভাবনা, অতএব সময়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এখানে যদি মনে রাখা যায়, নারী ব্যক্তি-বিশেষের নিকটে সম্বন্ধ-বিশেষেই দামী, অন্যথা নহে; তাহা হইলে অনেক কথা আপনিই পরিষ্কার হইয়া যাইবে। তবে আর একটা সম্বন্ধের কথা উঠিয়া

আপত্তি হইতে পারে, তাহা জননীর সম্বন্ধ। সে আলোচনা পরে হইবে।

যাঁহারা ইতিহাস পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, বিধবা-বিবাহ জগতের কোন দেশে কোনদিন সমাদর পায় নাই। কম-বেশী ইহাকে সকলেই অশ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া আসিয়াছে। এ অবস্থায় যে-দেশে এ-প্রথা একেবারেই নিষিদ্ধ, সে-দেশে পুড়াইয়া মারা যে বিশেষ হিতকর অনুষ্ঠান বলিয়াই বিবেচিত হইবে, তাহা আশ্চর্য নয়। অবশ্য এ-কথা স্বীকার করিতে অনেকেরই লজ্জা হইবে, কিন্তু পতিহীনা নারীর এখানে যখন আর তত আবশ্যক নাই, তখন কোনমতে ও-পারে রওনা করাইয়া দিতে পারিলে স্বামী মহাশয়ের কাজে লাগিবার সম্ভাবনা; এই ইচ্ছাই যে এ-প্রথার মূলে, এ-কথা অস্বীকার করা এক গায়ের জোর ভিন্ন আর কিছুতেই পারা যায় না। তা ছাড়া দেখা যায়, যে সমস্ত অসভ্য দেশে স্বামীর মৃত্যুর সহিত স্ত্রী-বধ হইত, তাহাদের ঐ বিশ্বাস একান্ত দৃঢ়। তাহারা মনে করে, মৃতের আত্মা কাছাকাছি, ঝোপে-ঝাপে, গাছপালায় বসিয়া থাকে, সুতরাং সঙ্গিনীকে পাঠাইয়া দিলে উপকার হইবে। কিন্তু আমাদের সুসভ্য এই প্রাচীন দেশ, যে-দেশে আত্মার স্বরূপ পর্যন্ত নির্ণীত হইয়া গিয়াছিল, ঈশ্বরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপিয়া শেষ করা হইয়াছিল, সে-দেশের পণ্ডিতেরাও যে বিশ্বাস করিতেন, বধ করিয়া সঙ্গে পাঠানো হয়, ইহাই আশ্চর্য। তবে এ যদি নারী-পূজার একটা বিশেষ পদ্ধতি হইয়া থাকে, ত সে আলাদা কথা। পুরুষ বুঝাইয়াছে, সহমৃতা হওয়া সতীর পরম ধর্ম। মনুও বলিয়াছেন, এক পতি-সেবা ব্যতীত স্ত্রীলোকের আর কোন কাজ নাই। সে ইহকালে পুরুষের সেবা করিয়াছে, পরকালে গিয়াও করিবে; কিন্তু কখন করিবে, কতদিন পরে করিবে, এত ঝঞ্ঝাটে সে যাইতে চাহে নাই। তাহার বিলম্ব সহে না, তাই মরণ-সম্বন্ধে একটু সত্বর ও সতর্ক হওয়াই সে আবশ্যক মনে করিয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন, এক মাতৃত্বের কারণেই সে পূজার্হা, সুতরাং সে সুযোগ না থাকিলে তাহাকে লইয়া আর কি হইবে? তারপর ছোট-বড় কীর্তি-

স্তম্ভ উঠিয়াছে, গল্পের মধ্যে, দৃষ্টান্তের মধ্যে তখন সে স্ত্রীর দাম চড়িয়া গিয়াছে। পুরুষ যে কেবলমাত্র নিজের সুখ ও সুবিধা ব্যতীত,—সেটা সত্যই হোক আর কাল্পনিক হোক—আর কোনদিকে দৃষ্টিপাত করে নাই, সে-কথা চাপা দিয়া গর্ব করিয়া প্রচার করিয়াছে, "যে-দেশে নারী হাসিতে হাসিতে চিতায় গিয়া বসিত, স্বামীর পাদপদ্ম ক্রোড়ে লইয়া প্রফুল্ল-মুখে নিজেকে ভস্মসাৎ করিত, ইত্যাদি ইত্যাদি—"

কিন্তু তাই যদি হয়, তবে স্বামীর মৃত্যুর পরই তাহার বিধবাকে একবাটি সিদ্ধি ও ধুতুরা পান করাইয়া মাতাল করিয়া দেওয়া হইত কেন? শ্মশানের পথে কখন বা সে হাসিত, কখন কাঁদিত, কখন বা পথের মধ্যেই ঢুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িতে চাহিত। এই তার হাসি, এই তার সহমৃতা হইতে যাওয়া! তার পর চিতায় বসাইয়া কাঁচা বাঁশের মাচা বুনিয়া চাপিয়া ধরা হইত, পাছে সতী দাহ-যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারে। এত ধূনা ও ঘি ছড়াইয়া অন্ধকার ধুঁয়া করা হইত যে, কেহ তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া যেন ভয় না পায়। এবং এত রাজ্যের ঢাক, ঢোল, কাঁসি ও শাঁখ সজোরে বাজানো হইত যে, কেহ যেন তাহার চীৎকার, কান্না বা অনুনয়-বিনয় না শোনে। এই ত সহমরণ! আমি জানি, এখানে অনেক রকমের আপত্তি উঠিবে। প্রথমেই উঠিবে, দেশের লোকের সত্যই যদি এই বিশ্বাস থাকে যে, সহমৃতা সতী পরলোকে স্বামীর সহিত বাস করিতে পায় এবং সেইজন্যই এ অনুষ্ঠান,—তাহা হইলেও আমার এই উত্তর যে, দেশের অশিক্ষিত ইতর লোক কি বিশ্বাস করিত, না করিত, সে আলোচনায় লাভ নাই, কারণ তাহারা শুধু ভদ্র ও শিক্ষিতের অনুকরণ ও অনুগমন করিত মাত্র। কিন্তু যে-দেশে তখনও টোল করিয়া মহামহোপাধ্যায়েরা সাংখ্য বেদান্ত পড়াইতেন, জন্মান্তর বিশ্বাস করিতেন, কর্ম-ফলে জীবের স্থাবর জঙ্গম পশু-জন্ম প্রচার করিতেন, দেবযান পিতৃযান প্রভৃতি পথের নির্দেশ করিতেন—তাঁহারা যে সত্যই বিশ্বাস করিতেন, পৃথিবীতে কর্মফল যাহার যাহা হোক, দুইটা প্রাণীকে একসঙ্গে বাঁধিয়া পোড়াইলেই

পরলোকে একসঙ্গে বাস করে—এ-কথা স্বীকার করা আমার পক্ষে কঠিন।

লেকি সাহেব লিখিয়াছেন, এই প্রথা ইংরাজেরা যখন তুলিয়া দেন, তখন টোলের পণ্ডিত-সমাজ চেঁচামেচি করিয়া, সভা-সমিতি করিয়া, রাজা-রাজড়ার নিকট চাঁদা তুলিয়া বিলাত পর্যন্ত আপীল করিয়াছিল। তাহাতে বলা হইয়াছিল, এ-প্রথা নিষিদ্ধ হইয়া গেলে হিন্দু-ধর্ম বনিয়াদসমেত বসিয়া হিন্দু একেবারে ধর্মচ্যুত হইয়া যাইবে। নারী-পূজা বটে!

তারপর আপীল যখন নিতান্তই না-মঞ্জুর হইয়া গেল, এবং বেশ বুঝা গেল, অতঃপর ঢাক ঢোল কাঁসি শাঁখের শব্দে পিয়াদার কান ঢাকা পড়িবে না, এবং ধূনা পোড়াইয়া সমস্ত নদীর কিনারাটা অন্ধকার করিয়া ফেলিলেও দারোগার দৃষ্টি এড়াইবে না, তখন ধর্মধ্বজেরও বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, সনাতন হিন্দুধর্মের বনিয়াদ ইঞ্চি-কয়েক বসিয়া গেলেও যদি বা চলে, পুলিশের হাঙ্গামায় পড়িলে চলিবে না। সুতরাং অন্য পথের সন্ধান দেখিতে হইল। রাজার কাজ রাজা করিয়া গেলেন, কিন্তু সমাজ-রক্ষকের কাজ বাড়িয়া গেল। এ-দুর্দিনে বসিয়া পড়িলে চলিবে না। তাঁহারা কহিলেন, ম্লেচ্ছ আমাদের ধর্ম বুঝিল না—আইন করিয়া বসিল; আমরা কিন্তু হাল ছাড়িব না। এইখানে বসিয়াই আমাদের বিধবাকে দেবী বানাইয়া তুলিব। তাহার পর শাস্ত্রের পুরাতন শ্লোক এতদিন যাহা অব্যবহারে কোথায় পড়িয়াছিল, তাহাই টানিয়া বাহির করিয়া, লোকাচারের দেহাই দিয়া, সুনীতির দোহাই দিয়া, যত রকমের কঠোরতা কল্পনা করা যাইতে পারে, সমস্তই সদ্য-বিধবার মাথায় তুলিয়া দিয়া, তাহাকে প্রত্যহ একটু একটু করিয়া দেবী করা হইতে লাগিল। সে নিরাভরণা, সে একবেলা খায়, সে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে, থান-ফাড়া কাপড় পরে, কেন-না সে দেবী। চীৎকার করিয়া পুরুষ প্রচার করিতে লাগিল, আমাদের বিধবার মত কাহার সমাজে এমন দেবী আছে! অথচ দেবীটিকে

বিবাহের ছাদনা-তলায় ঢুকিতে দেওয়া হয় না—পাছে দেবীর মুখ দেখিলেও আর কেহ দেবী হইয়া পড়ে। মঙ্গল-উৎসবে দেবীর ডাক পড়ে না, দেবীর ডাক পড়ে শ্রাদ্ধের পিণ্ড রাঁধিতে।

তার মা তাহাকে দেখিয়া হয়ত বা সহ্য করিতে পারিলেন না, অসুখে পড়িয়া মারা গেলেন। বাপ পঞ্চাশ বৎসর বয়সে 'দায়ে পড়িয়া' 'নিতান্ত অনিচ্ছায়' 'লোকের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া' তার চেয়ে ছোট একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলেন। ঘরের বিধবা মেয়ের উপর হুকুম হইয়া গেল, একটু সকাল সকাল, অর্থাৎ বেলা দশটার মধ্যে রাঁধিয়া বাড়িয়া তাহার বৌমাকে যেন খাওয়াইয়া দেওয়া হয়। না হইলে, ছোট মেয়ে হয়ত পিত্ত পড়িবে। এ-বাড়ীতে বিধবা-মেয়ে ও নববধূর মূল্য যে এক বাটখারায় ধার্য হইতে পারে না, সে কথা বোধ করি আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। বাপ ত বিবাহ করিয়া আনিলেন—ইনি প্রাচীন, সম্ভ্রান্ত, টোলের অধ্যাপক, শাস্ত্রজ্ঞানেরও নাকি সীমা নাই; বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে একখানা বইও লিখিয়াছেন,—কিন্তু সে যাহাই হোক, যে লোক এক বাটীর মধ্যে বাস করিয়া ও তাহার নিজের মেয়ের চেয়ে ছোট একটি মেয়েকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে পারে, সে যে কেমন করিয়া মুখে আনে, ঘরের কোণে নারীজাতিকে পূজা করি, এ আমার বুদ্ধির অগোচর। অথচ যে পুরুষ এ-রকমটি করে নাই, সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিবে, যে করে সে করে, আমরা ত পারি না। অর্থাৎ, সে ভাবিতে চায় না, এ অবস্থায় সে নিজে কি করিবে। অবশ্য, ও দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্বে কাহাকেও স্বীকার করিতে বাধ্য করা যায় না; কিন্তু শতকরা নিরানব্বই জন পুরুষ যে ঠিক এমনটিই করে, তাহা নিঃসন্দেহ। এক স্ত্রী জীবিত থাকিতেও পুরুষ ঘরের মধ্যে আরও এক শত স্ত্রী আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে, কিন্তু দ্বাদশ-বর্ষীয়া বালিকা বিধবা হইলেও তাহাকে দেবী হইতেই হইবে, এই ব্যবস্থা এ-দেশের সমস্ত নারী-জাতিকে যে কত হীন, কত

অগৌরবের স্থানে টানিয়া আনিয়াছে, সে-কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

থাক্ এ-কথা। আমাদের সহমরণের কথা হইতেছিল, এবং সেই সূত্রে পুরুষের নারী-পূজার উদ্যমের প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে যদি কেহ প্রতিবাদ করিয়া বলেন, এ-দেশে সমস্ত সতীকেই কি জোর করিয়া সহমরণে বাধ্য করা হইত? স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন কি ছিল না? রাজপুতের জহর-ব্রতের কথা কি জগৎ শুনে নাই? এই ত সেদিনও বাঙালীর ঘরে স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিবামাত্রই স্ত্রী সর্বাঙ্গে কেরোসিন ঢালিয়া পুড়িয়া মরিয়াছে। এমন পতিভক্তি, এমন গৌরবের কথা আর কোন্ দেশে শোনা যায়? শোনা যদি নাও যাইত, তাহাতেও পুরুষের যশ কিছুমাত্র বৃদ্ধি করিত না, কিংবা নারীর প্রতি পুরুষের শ্রদ্ধা-ভক্তিও সপ্রমাণ করিত না। তদ্ভিন্ন, বলপূর্বক হৌক, কৌশল করিয়াই হৌক, কিংবা মাতাল করিয়াই হৌক, একটিমাত্র নারীকেও দগ্ধ করা কি একটা দেশের পক্ষে যথেষ্ট নয়?[৯]

সেদিন ঐ কেরোসিনে আত্মহত্যা করায় দেশের অনেকেই বাহবা দিয়া বলিয়াছিল, হাঁ সতী বটে! অর্থাৎ, আরো দুই-চারিটি এমন্ ঘটিলে তাহারা খুশী হয়। এ ঘটনায় এ-দেশের পুরুষের মনের গতি যে কোন্‌দিকে, শুধু যে ইহাই বুঝিতে পারা গিয়াছিল, তাহা নয়, এমন দেশে একসঙ্গে বাস করিয়া নারীর মনের গতিও যে স্বভাবতঃ কোন্-দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে, তাহাও বুঝিতে পারা গিয়াছিল। যে যাহার আশ্রিত, সে তাহাকে সুখী করিতেই চায়। আমি যদি বাটীর মধ্যে সকলকেই একবাক্যে ঐ প্রশংসা করিতে শুনি, আমারো ঐ অবস্থায় সুখ্যাতি ও বাহবা-লাভের লোভ যে প্রবল হইয়া উঠিবে, তাহা অস্বাভা-বিক নহে। ইহার উপর ধর্মের গন্ধ আছে। সে-বেচারার হাতে নাকি গীতা ছিল। গীতায় কি ওই কথা বলে? কিন্তু সে ভাবিল, গীতা হাতে থাকিলে আরো ভাল। এখানে অশোভন উদাহরণ দিবার ইচ্ছা আমার না হইলে এই গৌরবান্বিত কেরোসিনে আত্মহত্যায় এমন

মেয়ের কথাও বলা যাইতে পারিত, যে সতীও নয়, এবং ঠিক স্বামীর শোকেও এ কাজ করে নাই। তা ছাড়া, শাশুড়ীর গঞ্জনায়, সময়ে বিবাহ না হইবার লাঞ্ছনায়—ইত্যাদি আরও অনেক সংবাদ খবরের কাগজে লিখে,—কিন্তু সে সব থাক্। আমাদের সতী-সাধ্বীর কথাই চলুক।

স্বামীর মৃত্যুতে কাহারও কাহারও আত্মহত্যা করিবার কি যে একটা প্রবল ঝোঁক হয়, তাহা যাহারা চোখে দেখিয়াছে তাহারাই জানে। আমি একজনকে তেতালার ছাদ হইতে পড়িয়া মরিতে দেখিয়াছি, আর একজনকে গলায় দড়ি দিতে দেখিয়াছি—বিষ খাইয়া মরিতে অনেক শুনিয়াছি; কিন্তু তাই বলিয়া এ মরা, আর চিতায় বসিয়া একটু একটু করিয়া দগ্ধ হওয়া এক বস্তু নয়। একটায় ঝোঁকের মাথায় মরা, কিন্তু আর একটায় আগুনের তাপে সে ঝোঁক বহু পূর্বেই কাটিয়া যায়; তখন আত্মবিসর্জন খুনে পরিণত হয়। টাইলার সাহেব বলেন, আফ্রিকার সর্দার-পত্নীরা বহুদিন পূর্ব হইতেই গলায় দিবার দড়ি নিজে মনোনীত করিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখে। হার্বার্ট স্পেন্সর লিখিয়াছেন, ফিজি দ্বীপে সদ্য-মৃত সর্দারের পত্নীরা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করা অত্যন্ত সৎকর্ম বলিয়া মনে করে, এবং কেহ বাধা দিলে তাহাতে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হয়। তিনি লিখিয়াছেন, The wives of the Fijian chiefs consider it a sacred duty to suffer strangulation on the deaths of their husbands. A woman who has been rescued by Williams escaped during the night, and presenting herself to her own people, insisted on the completion of the sacrifice which she had in a moment of weakness reluctantly consented to forego; and Wilkes tells of another who loaded her rescuer with abuse, and ever afterwards manifested the most deadly hatred towards him. ইহাতে কি বুঝা যায়? বুঝা যায় যে, সহমরণ গৌরবের কাজ হইলে আর্য-জাতি ভিন্ন আরো অনেক

নীচ জাতি আছে যাহারা তুল্য গৌরবের অধিকারী। আরো একটা কথা এই,—পুরুষেরা যাহা ইচ্ছা করে, যাহা ধর্ম বলিয়া প্রচার করে, নারী তাহাই বিশ্বাস করে, এবং পুরুষের ইচ্ছাকেই নিজের ইচ্ছা বলিয়া ভুল করে এবং ভুল করিয়া সুখী হয়। হইতে পারে, ইহাতে নারীর গৌরব বাড়ে, কিন্তু সে-গৌরবে পুরুষের অগৌরব চাপা পড়ে না। যাই প্রশ্ন করা হয়, এত নিষ্ঠুর প্রথা কেন? উত্তর তৎক্ষণাৎ মুখে আসিয়া পড়ে, পরলোকে গিয়া স্বামীর সেবা করিবে। অথচ পরলোক যে কি, তাহা কয়টা পুরুষ জানে? আশ্চর্য, এত অত্যাচার, অবিচার, পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা সহ্য করা সত্ত্বেও নারী চিরদিন পুরুষকে স্নেহ করিয়াছে, শ্রদ্ধা করিয়াছে, ভক্তি করিয়াছে এবং বিশ্বাস করিয়াছে। যাহাকে সে পিতা বলে, ভ্রাতা বলে, স্বামী বলে, সে যে এত নীচ, এমন প্রবঞ্চক, এ-কথা বোধ করি সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। বোধ করি এইখানেই তাহার মূল্য।

'বিল্বমঙ্গল' একখানি প্রসিদ্ধ নাটক। বহুদিন হইতে ইহা প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে। বাঙালী আপত্তি করে না, কারণ ইহাতে ধর্মের কথা আছে। সহস্র লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বণিক লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিয়া নিজের সহধর্মিণীকে লম্পট অতিথির শয্যায় প্রেরণ করে। দর্শক অর্থ ব্যয় করিয়া দেখে এবং খুব তারিফ দিতে থাকে। বণিকের বক্তৃতার সারমর্ম এই, সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, এ-বাড়িতে অতিথি বিমুখ করিবে না। পাছে তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, পাছে অধর্ম হয়, পাছে মৃত্যুর পর যমদূতে ডাঙস মারে—এই তার ভয়। তাহার মনের ভাবটা এই যে, আমার পায়ে তৃণাঙ্কুরও না বিদ্ধ হয়—তোমার যা হয় তা হোক। তা ছাড়া, শাস্ত্রে আছে, সর্বস্ব দিয়াও অতিথি-সৎকার করিবে। অর্থাৎ ধন-দৌলত, হাতি-ঘোড়া, গোরু-বাছুর, যা কিছু সম্পত্তি আছে—সমস্তই। কিন্তু অতিথিটা যখন ও-সব চায় না, তখন তুমিই যাও। আমার কাছে সে তোমাকে চাহিয়াছে—এবং তুমি আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে। স্বামীর কাছে

পতিব্রতা স্ত্রীর সম্মান এই! অপরিচিত পাপিষ্ঠ অতিথির সেবার তুলনায় স্ত্রীর মূল্য এই! যাহারা বিল্বমঙ্গলের ভক্ত, তাহারা প্রতিবাদ করিয়া বলিবে, অতিথির জন্য হিন্দু প্রাণ দিতে পারে,—কর্ণ পুত্রহত্যা করিয়াছিল। এ-সব কথা আমিও জানি। দাতা কর্ণ মস্ত কাজ করিয়া ছিলেন, বণিকও মস্ত কাজ করিয়াছে। কিন্তু কথা সে নয়। প্রাণটা তোমার নিজের; ইচ্ছা হয়, সেটা না হয় দিতে পারো, কিন্তু এই যে ধারণা—স্ত্রী তোমার সম্পত্তি, তুমি স্বামী বলিয়া, ইচ্ছা করিলে এবং প্রয়োজন বোধ করিলে, তাহার নারী-ধর্মের উপরও অত্যাচার করিতে পারো, তাহাকে রাখিতেও পারো, মারিতেও পারো, বিলাইয়া দিতেও পারো,—তোমার এই অনধিকার, এই স্বেচ্ছাচার তোমাকে এবং তোমার পুরুষ-জাতিকে হীন করিয়াছে, এবং তোমার সতী স্ত্রীকে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত নারী-জাতিকে অপমান করিয়াছে। অতিথি-সেবা খুব মস্ত ধর্ম হইতে পারে, কিন্তু সেজন্য যেমন তুমি চুরি-ডাকাতি করিতে পারো না, এটাও ঠিক তেমনি পারো না। ইহুদিরা যখন পশুর মত ছিল, তখন তাহারা সম্পত্তির সঙ্গে স্ত্রীর বখ্রা করিত। এখনও অনেক অসভ্য জাতি বাড়ী-ঘর জমিজমা গরু-বাছুরের সঙ্গে বাড়ীর স্ত্রীগুলিকেও ভায়ে ভায়ে ভাগ করিয়া লয়। স্ত্রীজাতি-সম্বন্ধে বণিকের ধারণাও প্রায় এমনি। আর অতিথি-সৎকার যদি এতবড় ধর্মই হয়, যার কাছে সতী স্ত্রীর সর্বস্ব নষ্ট করিয়া ফেলাও ধর্ম-পালন, তবে এখনো যাহারা এই ধর্ম রাখিয়া চলে, তাহাদের নীচ বলা শোভা পায় না।

আমেরিকার অসভ্য ছিন্নুক জাতির সম্বন্ধে কাপ্তেন লুইস্ বলিয়াছেন, ইহারা অতিথির শয্যায় বাটীর শ্রেষ্ঠ কন্যাটিকে, না হয়, স্ত্রীকে পাঠাইয়া দেওয়া অতি উচ্চ অঙ্গের ধর্ম-পালন বলিয়া মনে করে। এশিয়ার চুক্চি জাতি-সম্বন্ধে অর্ম্যান সাহেব লিখিয়াছেন,—The Chuckchis offer to travellers, who chance to visit them, their wives and also what we should call their daughters' honour. কাপ্তেন লায়ন

এবং সার্‌জন লবক্‌, এসকুইমো, কামস্কাটকা-নিবাসী ও কালমুখদের সম্বন্ধেও ঠিক এমনি অথিতি-সেবার ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। হারবার্ট স্পেন্সের তাঁহার Descriptive Sociology গ্রন্থে এমনি বহুতর দয়ার কাহিনী প্লস্‌ ও প্যালাস সাহেবদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন! জিজ্ঞাসা করি, ইহাদের সহিত আমাদের ধার্মিক বণিকটির প্রভেদ কোন্‌খানে? সে-দেশের পুরুষেরাও যাহা কর্তব্য এবং যাহা ধর্ম বলিয়া মনে করিয়াছে, তাহাই পালন করিয়াছে—ইনিও তাই। অতিথিকে সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছা উভয়েরই সমান, উভয়েই মনে করিয়াছেন, অতিথি সন্তুষ্ট না হইলে আমার পাপ হইবে, আমি কষ্ট পাইব। কথাটাকে যেমন ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেও ওই একটা 'আমি' ছাড়া আর কিছুই পাইবার যো নাই। ওই 'আমি'টার মধ্যে নারীর প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা যে কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না।

ভগবান শঙ্করাচার্য স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, নরকের দ্বার নারী। বাইবেল বলিয়াছেন, root of all evils, অর্থাৎ সমস্ত অহিতের মূল। ইয়োরোপ-প্রসিদ্ধ লাটিন ধর্মযাজক কারটুলিয়ান নারীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—Thou art the devil's gate, the betrayer of the tree, the first deserter of the divine law. ধর্মযাজক সেণ্ট অগষ্টিন, যিনি 'সেণ্ট' পদবী পাইয়া গিয়াছেন, তিনি তাহার শিষ্য-মণ্ডলীকে শিখাইতেছেন, What does it matter whether it be in person of mother or sister, we have to be beware of Eve in every woman. সেণ্ট অ্যাম্‌ব্রোস—ইনিও 'সেণ্ট'—তর্ক করিয়া গিয়াছেন, Remember that God took a rib out of Adam's body, not a part of his soul to make her.

৫৭৮ খৃষ্টাব্দে আহূত ওসিয়ার ক্রীশ্চান ধর্ম-সঙ্ঘে নাকি স্থির হইয়াছিল স্ত্রীলোকের আত্মা নাই। ধর্মের জন্যে যে নারী-জাতি মরে বাঁচে, যে ধর্ম-গ্রন্থের প্রত্যেক অক্ষরের প্রতি নারীর অচলা ভক্তি, সেই

ধর্মগ্রন্থ লিখিবার সময় পুরুষ নারী-জাতিকে কি শ্রদ্ধাই দেখাইয়া গিয়াছে! মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ সেণ্ট বার্নার্ড (ইনিও 'সেণ্ট') জননীর উদ্দেশে পত্র লিখিয়াছেন—

What have I to do with you? What have I received from you but sin and misery? Is it not enough for you that you have brought me into this miserable world, that you being sinners have begotten me in sin……

আজ ইয়োরোপবাসীরা অহঙ্কার করিয়া বলে, তাহারা যেমন নারীর dignity বোঝে, এমন আর কেহ নহে। অথচ, নারী-জাতিকে গত ১৩-১৪ শত বৎসর ধরিয়া যেরূপ অসহ্য ঘৃণা করিয়াছে, যত ক্লেশ দিয়াছে, যত অবনত করিয়াছে, তত আর কোন জাতি করিয়াছে কি-না সন্দেহ। ইহাদের sacerdotal celibacyর ইতিহাস প্রভৃতির পাতায় পাতায় যে পুণ্য-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়া আছে, তৎসত্বেও ইহাদের মুখের শ্রদ্ধা-ভক্তির কথা উপহাস ব্যতীত যে আর কি হইতে পারে জানি না।

যে ধর্ম বনিয়াদ গড়িয়াছে, আদিম জননী ইভার পাপের উপর যে ধর্ম সংসারের সমস্ত অধঃপতনের মূলে নারীকে বসাইয়া দিয়াছে, সে ধর্ম সত্য বলিয়া যে কেহ অন্তরের মধ্যে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহার সাধ্য নয় নারীজাতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তাহার শ্রদ্ধা শুধু ততটুকুই হইতে পারে, যতটুকুতে নিজের স্বার্থ জড়িত হইয়া আছে। তাহার অধিক শ্রদ্ধাই বল, ন্যায্য অধিকারই বল, সহস্র বৎসর পূর্বেও পুরুষে দেয় নাই, সহস্র বৎসর পরেও দিবে না। মিল সাহেব তাঁহার Subjection of Women গ্রন্থে 'isolated' বলিয়া মিথ্যা দুঃখ করিয়া গিয়াছেন।

শুনিতে পাই এক মহানির্বাণতন্ত্রের "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" আদেশ ছাড়া আর কোন শাস্ত্রেই নারীকে শিক্ষা দিবার হুকুম নাই। স্বর্গীয় অক্ষয় দত্ত মহাশয় তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্র-

দায়' গ্রন্থের উপক্রমণিকা খণ্ডে ইহার বিরুদ্ধে বিস্তর আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, প্রাচীনকালে স্ত্রীলোক বেদ পর্যন্ত তৈয়ারি করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু এ-সমস্ত তর্ক কোন কাজেই লাগে না, পুরুষ যখন শাস্ত্রের "ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" শ্লোকের সন্ধান পাইয়াছে। ইয়োরোপের কোন এক প্রাচীন ধর্মযাজক লিখিয়া গিয়াছেন—Shall the maid Olympias learn philosophy ? By no means woman's philosophy is to obey laws of marriage. মার্টিন লুথার সর্বদাই বলিতেন—No gown worse becomes a woman than the desire to be wise. চীনেদের দেশে একটা প্রচিলত বাক্য আছে, জ্ঞান যেমন পুরুষের শোভা বৃদ্ধি করে, অজ্ঞান তেমনি স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। ইহার পর সে আর পুরুষের হাতহইতে কি মঙ্গল আশা করিতে পারে ? কবে উর্বশী বেদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কেন শ্রৌতসূত্রে পত্নীকে বেদ প্রদান করিবার কথা ছিল, স্বামী প্রবাসে থাকিলে কি-হেতু দশ পৌর্ণ-মাস ব্রতে স্ত্রীর হোম করিবার অধিকার হইয়াছিল, বৃহদারণ্যকোপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী, যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী সংবাদ কেন রচিত হইয়াছিল, এ-সব আলোচনা অরণ্যে রোদন। ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে মিশর প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার দিনে নারীর অধিকার-সম্বন্ধে মাস্‌পেরো "husband a privileged guest", "she inherited equally with her brothers", "mistress of the house", "judicially equal of man", "having the same rights and being treated in the same fashion", ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়াছেন। এই সভ্যতার আলো রোম পাইয়াছিল বলিয়া তাহার নারী-জাতিও এ-সময় যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল। এই pagan law পরবর্তী সুসভ্য আইন-কানুনের মধ্যে কোথায় ডুবিয়াছে, মেম সাহেব তাঁহার Ancient Law গ্রন্থে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন।

সার হেন্‌রির এই অধ্যায়টা আমি সকল শিক্ষিতা রমণীকেই পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

ইউরোপের আইন-কানুনের মধ্যে প্রাচীন রোমের প্রভাব যথেষ্ট লক্ষিত হইলেও, নারী-সম্বন্ধে ইহুদিদের কড়া ব্যবস্থাই অধিক স্থান পাইয়াছে। কেন না, এইগুলাই পুরুষের ভাল লাগিয়াছে এবং মনের সঙ্গে মিলিয়াছে। প্রথমে মনে হয় বটে, ধর্মের নৈকট্য হেতু ইহাই ত স্বাভাবিক। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, স্বাভাবিক বটে; কিন্তু শুধু তাহা ধর্মের ঘনিষ্ঠতা হেতুই স্বাভাবিক নয়, তাহা পুরুষের মনোনীত হইয়াছে বলিয়াই স্বাভাবিক হইয়াছে। অবশ্য ধর্মের চাপ ত আছেই। যীশু খৃষ্ট অনেক কথাই বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু স্ত্রীজাতির উপর অত্যাচার-সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া একটি কথাও বলিয়া যান নাই। জগৎবিখ্যাত সেণ্ট পল শিখাইয়াছেন, ধর্ম-সম্বন্ধে নারী পুরুষের মত কোন প্রশ্ন করিতে পারিবে না। সে সর্বদাই তাহার স্বামীর অধীন,—যে-হেতু ঈশ্বর নারীকে পুরুষের জন্যই সৃজন করিয়াছেন, পুরুষকে নারীর জন্য সৃজন করেন নাই। আরও বলিয়াছেন, নারী কোন পুরুষকে শিক্ষা দিতে পারিবে না। সে-ই সংসারে পাপ প্রবেশ করাইয়াছে। তাহারা অনন্ত নরকে ডুবিবে—সদ্গতির কোন উপায় নাই। তবে সদ্গতি হইতে পারে, গর্ভে সন্তান ধারণ করিতে পারিলে। ঈশ্বর-জানিত পল ঠাকুরের উক্তি কি সুন্দর! নারীর মুক্তির কি সোজা পথ, এবং এই পথের পরিচয় বিলাতের যে কোন ধর্মগ্রন্থ খুলিলেই চোখে পড়ে। আমাদের শাস্ত্রে সন্তানের জন্যই নারী মহাভাগা, এবং পুত্রের জন্যই ভার্যা গ্রহণের ব্যবস্থা আছে, এবং সংসারের যে কোন দেশের ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখিলে কম-বেশী এইরকমের ব্যবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়।

নারীর সম্মান তাহার নিজের জন্য নহে, তাহার সম্মান নির্ভর করে পুত্র-প্রসবের উপর। পুরুষের কাছে এই যদি তাহার নারী-জীবনের একটিমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, ইহা কোনমতেই তাহার গৌরবের বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু সত্যই তাই। এ-ছাড়া তাহার কাছে সংসার আর কিছু আশা করে না, এবং সে যত কিছু সম্মান দিয়া আসিয়াছে,

তাহা এইজন্যই। আমাদের শাস্ত্রে ক্ষেত্রজ সন্তানের বিধি আছে। কুন্তীকে পঞ্চপাণ্ডবের, অম্বিকা-অম্বালিকাকে পাণ্ডু-ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম দিতে হইয়াছিল। সতী নারীর পক্ষে ইহা শ্লাঘার কথা নহে। প্রাচীন ইহুদি-সমাজে অপুত্রক বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে সন্তান-কামনায় দেবরের উপপত্নী হইয়া থাকিতে হইত। নারীর জন্য যে-সকল শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থা ডুটর্‌নমির পঁচিশ অধ্যায়ের গোড়ার দিকে লিপিবদ্ধ করা আছে, পড়িলে ঘৃণা জন্মিয়া যায়। মনে হয়, সন্তান কামনায় ইহাদের সমাজে নারীকে কি না করিতে হইত। এমনি আফ্রিকাতেও সন্তানের জন্য নারীকে বাধ্য হইয়া অসাধ্য সাধন করিতে হইত। হার্‌বার্ট স্পেন্সর লিখিয়াছেন, Dahoman like all other semi barbarians considers a numerous family the highest blessing. আফ্রিকার পূর্ব অঞ্চলে it is no disgrace for an unmarried woman to become the mother of numerous family ; woman's irregularities are easily forgiven if she bears many children. ওটিয়াকুস্‌দিগের মধ্যে it is honourable for a girl to have children. She then gets a wealthier husband and her father is paid a higher halym for per. ওল্ড টেষ্টামেণ্ট বাইবেলের মতে স্ত্রীর সন্তান না হওয়া মহাপাপ। নারীর মূল্য কি দিয়া যে ধার্য হয়, সে-কথা বুঝাইবার জন্য আর বেশী নজির তুলিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। পুরুষের এই স্বার্থের জন্যই যে তার মান, এই জন্যই যে মর্যাদা, আবশ্যক হইলে এ সত্য আরও সহস্র প্রকারে প্রমাণ করা যায়, কিন্তু সে প্রয়োজন বোধ করি নাই। কিন্তু স্বার্থের জন্যই যে পুরুষ তাহাকে চিরদিন নির্যাতন এবং অপমান করিয়া আসিয়াছে, এ-সম্বন্ধে আরো কিছু বলা আবশ্যক ; কেন না, এ-কথা পুরুষে বুঝিলেও স্ত্রীলোক বুঝে না, বোধ করি বুঝিতেও চাহে না। সংসারে ছোটখাটো সুখ-শান্তির মধ্যে থাকিয়া, স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া, কি করিয়া সে মনে করিবে, এই স্বামী তাহার আন্তরিক মঙ্গল কামনা করে না! পিতার কাছে দাঁড়াইয়া কি

করিয়া সে ভাবিবে, এই পিতা তাহার মিত্র নহে ; বাস্তবিক পৃথক্‌ভাবে একটি একটি করিয়া দেখিলে, এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করা অসাধ্য। কিন্তু সমগ্রভাবে সমস্ত নারী-জাতির সুখ-দুঃখের, মঙ্গল-অমঙ্গলের ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিলে, পিতা, ভ্রাতা, স্বামীর সমস্ত হীনতা, সমস্ত ফাঁকি একমুহূর্তেই সূর্যের আলোর মত ফুটিয়া উঠে। একটু বুঝাইয়া বলি। কোন একটা বিশেষ নিয়ম যখন দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহা যে একদিনেই হইয়া যায়, তাহা নহে, ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইতে থাকে। যাঁহারা সম্পন্ন করেন, তাঁহারা পুরুষের অধিকার লইয়া করেন। তখন তাঁহারা পুরুষ—পিতা নন, ভ্রাতা নন, স্বামী নন। যাঁহাদের সম্বন্ধে নিয়ম করা হয়, তাঁহারাও আত্মীয়া নহে, নারী মাত্র। পুরুষ তখন পিতা হইয়া কন্যার দুঃখের কথা ভাবে না ; সে তখন পুরুষ হইয়া পুরুষের কল্যাণ চিন্তা করে—নারীর নিকট হইতে কতখানি কিভাবে আদায় করিয়া লইবে, সেই উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকে। তার পর মনু আসেন, পরাশর আসেন, মোজেজ আসেন, পল আসেন—শ্লোক বাঁধেন, শাস্ত্র তৈয়ারি করেন—স্বার্থ তখন ধর্ম হইয়া সুদৃঢ়-হস্তে সমাজ শাসন করিবার অধিকার লাভ করে। দেশের পুরুষ-সমাজ ব্যাসদেব, শাস্ত্রকারেরা গণেশ-ঠাকুর মাত্র। সকল দেশের শাস্ত্রই অনেকটা এই-ভাবেই প্রস্তুত। তার পর শাস্ত্র মানিয়া চলিবার দিন আসে। ধর্মের আসন জুড়িয়া বসিতে তাহার বিলম্ব ঘটে না, এবং সেই ধর্ম-পালনের মুখে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, স্নেহ-মমতা, ভাল-মন্দ বন্যার তৃণের মত ভাসিয়া যায়। দেশের সহমরণেও তাহা দেখিয়াছি, অন্যান্য দেশের অধিকতর নিষ্ঠুর ব্যাপারের মধ্যেও তাহা দেখিয়াছি। ইহুদিরা ঠাকুরের সম্মুখে পুত্র-কন্যা বলি দিতে কুণ্ঠিত হইত না। সন্তান-হত্যার কত নিষ্ঠুর ইতিহাস যে তাহাদের ধর্ম-পুস্তকের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আছে, তাহার সংখ্যা হয় না। তাদের মলেক দেবতাটি ত শুধু এইজন্যই অমর হইয়া আছেন। মেক্সিকো-বাসী পিতা-মাতারা তেজকাটলিপোকা ঠাকুরের সম্মুখে তাহাদের শ্রেষ্ঠ কন্যাটিকে হত্যা করিয়া পুণ্য অর্জন

করিতে লেশমাত্র দ্বিধা করিত না। দাতা কর্ণের মত, ধর্মের নামে পুত্র হত্যা করিতে অনেক দেশে অনেক রাজাকেই দেখা যায়। মেবারের রাজা পুত্র বলি দিয়াছিলেন, কার্থেজের রাজা দেবতার সম্মুখে কন্যা বধ কবিয়াছিলেন। প্রাচীন দিনের বোধ করি এমন একটি দেশও বাকী নাই, যেখানে ধর্মের নামে সন্তান-হত্যা ঘটে নাই। তবে কি, তখনকার দিনে পিতা-মাতারা সন্তানকে ভালবাসিত না? বাসিত নিশ্চয়ই, কিন্তু কোথায় ছিল তখন স্নেহ-মমতা? থাকিতে পায় না। প্রথা যখন একবার ধর্ম হইয়া দাঁড়ায়, দেবতা প্রসন্ন হন, পরকালের কাজ হয়; তখন কোন নিষ্ঠুরতাই আর অসাধ্য হয় না। বরঞ্চ, কাজ যত নিষ্ঠুর, যত বীভৎস হয়, পুণ্যের ওজনও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সন্তান বলিয়া পিতা-মাতা আর তখন মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ায় না।

কোন কোন ক্ষেত্রে মায়া-মমতা হয়ত বাধা দিতেও আসে, কিন্তু তখন আর উপায় থাকে না। স্বার্থের জন্য পুরুষ সাধারণভাবে একবার যে প্রথাকে ধর্মের অনুশাসন বলিয়া প্রতিষ্ঠা করে, পিতা হইয়া আর সেই প্রথাকে নিজের সন্তানের বেলা অতিক্রম করিতে পারে না।

পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত যখন তাহাকে বালিকা কন্যার বিবাহ দিতে হয়, হয়ত তাহার ক্ষণকালের জন্য বুকে বাজে' কিন্তু উপায়ও সে খুঁজিয়া পায় না। তাহাকে জাত বাঁচাইতে হইবে, ধর্ম রক্ষা করিতে হইবে। যে প্রথা সে পুরুষ হইয়া, সমাজের একজন হইয়া নিজের হাতে গড়িয়াছে, এখন সেই প্রথা তাহাকে এক হাতে চোখ মুছায়, আর এক হাতে সম্প্রদান করিতে বাধ্য করে। স্নেহের এতবড় জোর নাই যে, তাহাকে এই নির্দয় কর্ম হইতে বিরত করিতে পারে। সুতরাং দেখা যায়, স্নেহ-মায়া-দয়া থাকা সত্ত্বেও লোকে অমঙ্গল করিতে পারে, এবং পরম আত্মীয় হইয়াও পরম শত্রুর মতই ক্লেশ দিতে পারে। আজ সে স্বার্থের কথা মনে করিতে পারিবে না। জানি এখন সে ধর্মের দোহাই পাড়িয়াই আপনাকে শান্ত করিবে। কিন্তু কোথায় ইহার সুদূর

মূল নিহত আছে, ইহা যদি সে তলাইয়া দেখিতে চাহে সেখানে অখণ্ড স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই সে দেখিতে পাইবে না। কিন্তু এ দেখা কটিন—পিতার পক্ষেও কঠিন, তাহার কন্যার পক্ষেও কঠিন। প্রতিষ্ঠিত নিয়ম পালনের মধ্যে মানুষ যখন একান্ত মগ্ন হইয়া থাকে, চোখের দৃষ্টিও তখন তাহার রুদ্ধ হইয়া যায়। সে কোনমতেই দেখিতে পায় না, কোন্‌টা ধর্ম কোন্‌টা অধর্ম। বৈদিক যজ্ঞের অগণিত পশু-হত্যার মধ্যে কোথায় অন্যায় ছিল, মানুষ তখনই শুধু দেখিতে পাইয়াছে বুদ্ধদেব যখন তাহাকে পৃথক্ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। সহমরণ আজ রহিত হইয়া গিয়াছে, তাই আজ সে-কথা মনে করিয়া শিহরিয়া উঠি। গঙ্গা-সাগরে সন্তান নিক্ষেপ করার মধ্যে কত পাপ গোপন ছিল, আজ তাহা দেখিতে পাইয়া ইংরাজের আইনকে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করি। অথচ সে-সময় কত না লড়াই করিয়াছি। গাঁটের পয়সা অপব্যয় করিয়া বিলাত পর্যন্ত আপীল করিয়াছি। যাহারা প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিল, আপীল করিতে বাধা দিতে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদিগকে পরম মিত্র বলিয়া আহ্বান করিয়াছি, স্বর্গীয় রামমোহনকে ধর্মদ্বেষী রাক্ষস বলিয়া গালি-গালাজ দিয়াছি। আজ সে ভ্রম বোধ করি ধরা পড়িয়াছে—তথাপি চৈতন্য হয় নাই। আজও সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজিতে টোলের ভট্‌চাযির নিকট ছুটিয়া যাই। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, তাহাদিগকে গিয়া প্রশ্ন করি ; কারণ তাহারা শাস্ত্রবিৎ। কিন্তু এ-কথাটা একবারো ভাবি না, তাহারা শাস্ত্রের শ্লোকই জানে—আর কিছু জানে না। বিদ্যার চরম উদ্দেশ্য যদি হৃদয় প্রশস্ত করা হয়, তাহাদের অধিকাংশেরই পড়া-শুনা যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা একবারও চিন্তা করি না। মেয়ের কত বয়সে বিবাহ দেওয়া উচিত, জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা শাস্ত্র আওড়ায়, বিধবা-বিবাহ উচিত কি না, জানিতে চাহিলে পুঁথি খুলিয়া বসে—মিলাইয়া দেখিতে চায় শ্লোকে কি বলে ; শাস্ত্র তাহাদের দৃষ্টি ক্ষীণ করিয়া রাখিয়াছে। শাস্ত্রের বাহিরে তাহারা দেখিতে পায় না, শাস্ত্রের বাহিরে তাহারা পা বাড়াইতেও

পারে না। ইহারা মুখস্থ করিবার ক্ষমতাকেই বুদ্ধি বলিয়া মনে করে, এই মুখস্থ করাটাকেই জ্ঞান বলিয়া জানে। এই জ্ঞান ইহাদের অধিকাংশ অবস্থাতেই যে অনুস্বর-বিসর্গকে অতিক্রম করিতে পারে না, তার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার শ্রীগোপাল মল্লিক ফেলোশিপের দ্বিতীয় লেক্‌চারে নামকরণ-প্রণালীর মধ্যে বলিয়াছেন, "কেহ কেহ বলেন, মেরুতন্ত্রে লণ্ডন নগরের উল্লেখ আছে, অতএব উহা নিতান্ত আধুনিক ; কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, পুরাণাদিতে অনেক ভবিষ্যদুক্তি আছে। মেরুতন্ত্রেও ভবিষ্যদুক্তি স্থলেই লণ্ডন নগরের উল্লেখ আছে। সুতরাং তদ্দারা মেরুতন্ত্রের আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না। উহা যে ভবিষ্যদুক্তি, তাহা দেখাইবার জন্য মেরুতন্ত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে—

পূর্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতিং প্রকীর্তিতা
ফিরিঙ্গি ভাষয়া মন্ত্রা যেষাং সংসাধনাৎ কলৌ।
অধিপামণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ।
ইংরেজা নবষট্‌ পঞ্চ লণ্ড্রজাশ্চাপিভাবিনঃ।"

অথচ, স্বর্গীয় অক্ষয় দত্ত মহাশয় ছদ্ম শাস্ত্রকারগণের জুয়াচুরি সপ্রমাণ করিতে মেরুতন্ত্রের এই শ্লোকটাই তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে'র উপক্রমণিকায় উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের উভয়ের পাণ্ডিত্যই অতি গভীর ছিল, অথচ একজন যে শ্লোকের অস্তিত্বে শ্লাঘা বোধ করিয়াছেন, আর একজন তাহাকেই ঘৃণার সহিত বর্জন করিয়াছেন। এ-স্থলে কাহার বিচার সমীচীন, তাহা বুঝিতেও যেমন বিলম্ব হয় না, স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের মত দেশ-প্রসিদ্ধ পণ্ডিতচূড়ামণির মুখে এমন কথা, সংস্কৃত শ্লোকের উপর এতবড় অন্ধবিশ্বাস দেখিয়াও আর আশা-ভরসার স্থান থাকে না। পণ্ডিত মহাশয় আবার নিজেই বলিয়াছেন—মেরুতন্ত্রের প্রামাণ্য সন্দেহ করিবার অন্য কারণ আছে ; তাহা এই—পারস্য ভাষায় ও ফিরিঙ্গি

ভাষায় যে-সকল মন্ত্রের কথা বলা হইয়াছে, তত্তদ্ভাষাবিদেরা জানেন যে, বস্তুগত্যা উহাদের অস্তিত্ব নাই।

এইখানে অতি অনিচ্ছায় তাহার মনে একটু খটকা বাজিয়াছে। তা সে কিছুই নয়। পুরাণাদিতে যখন যোগবলে হাত গণিয়া ভবিষ্যৎ বলা হইয়াছে, মেরুতন্ত্রের গ্রন্থকারও তেমন হাত গণিয়া লণ্ডন নগরের এবং কলিকালে মন্ত্রসিদ্ধ ইংরাজের পরাক্রমের কথা বলিবেন, ইহা বিচিত্র কি? এইজন্য তিনি পূর্ব হইতেই সন্দেহকারীকে সতর্ক করিয়া পুরাণাদির ভবিষ্যদুক্তির কথা পড়িয়াছেন। ধন্য বিশ্বাস! ধন্য যুক্তি! আমি জানি, আমার কথাগুলা অনেকেরই ভাল লাগিতেছে না এবং বিরুদ্ধ তর্ক করিবার ইচ্ছা থাকিলে অনেকরকমেই করা যাইবে। কিন্তু ইহা তর্কের কথা নহে, বিবাদ-বিসংবাদের বস্তু নহে—ভাবিবার বিষয়, কাজ করিবার সামগ্রী। স্বদেশ-বিদেশের শাস্ত্রে, ইতিহাসে যাবতীয় জাতির আচার-ব্যবহার-সম্বন্ধে আমার চেয়ে যাঁহার পড়াশুনা অধিক, তর্ক করিবার ইচ্ছা করিলে আমাকে পরাস্ত করিতে পারিবে জানি, কিন্তু যে সত্য আমি হৃদয়ের ব্যথার ভিতর দিয়া বাহির করিলাম, সে সত্যকে কোন মহামহোপাধ্যায় যে উড়াইয়া দিতে সক্ষম হইবেন না, তাহা নির্ভয়ে বলিতে পারি। বাস্তবিক, আমার হার-জিৎ যাহাই কেন-না হৌক, এ-কথাটা কিন্তু নিশ্চয় করিয়াই দেখিবার সময় আসিয়াছে, যথার্থ সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসার ভার সমাজের কাহাদের হাতে থাকা উচিত। যাঁহারা জোর করিয়া এতদিন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাও করুন। দুর্গা-পূজার মহাষ্টমী দুই দণ্ড আগে বসিবে, কি পরে বসিবে, বিড়াল-মারার প্রায়চিত্তে এক কাহন কিংবা পাঁচ কাহন কড়ি প্রশস্ত, মহান্ত মহারাজেরা বেশ্যা রাখিলে স্বর্গে যায়, কিংবা বিবাহ করিলে পতিত হয়, এ-সব মীমাংসা তাহারাই করিতে থাকুন, কিছুমাত্র আপত্তি করি না। কিন্তু সমাজের ভাল-মন্দ কিসে হয়, না হয়, কোন্ নিয়ম রাখিলে বা পরিবর্তন করিলে আধুনিক সমাজের কল্যাণ বা অকল্যাণ হইবে, স্বদেশের কাজে বিলাত গেলে জাতি যাইবে কি

যাইবে না, এ-সমস্ত দুরূহ বিষয়ে তাহাদের হাত দিতে যাওয়া অনধিকার-চর্চা। এ-সমস্ত প্রশ্ন নিষ্পত্তি করার অধিকার দেশের শুধু তাঁহাদেরই জন্মিয়াছে, শিক্ষা যাঁহাদের হৃদয় প্রশস্ত করিয়া সার্থক হইয়াছে। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগরের মত যাঁহাদিগকে সমাজের ভাল-মন্দ স্থির করিয়া দিতে ভগবান নিজের হাতে গড়িয়া পাঠাইয়াছেন, যাঁহা-দিগকে দেশের লোক বড় বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, এ-সমস্ত সামাজিক প্রশ্নের ভারও দেশের সেই সমস্ত মহৎ লোকের উপর—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের উপর নহে। কেমন করিয়া জানিবে ইহারা শাস্ত্র, কেন শাস্ত্র? কোন্‌টা প্রতারণা? কি করিয়া বুঝিবে ইহারা, তখন কি দোষ-গুণ সমাজে বিদ্যমান ছিল, এখন কি দোষ-গুণ আছে? কোন্ টোলে এ আলোচনা হয়? কোন্ স্মৃতিরত্নের এ আলোচনা করিবার ধৈর্য এবং সাহস আছে? নিজের দলটি ছাড়া ইহাদের কাছে সবাই ম্লেচ্ছ, সবাই অশুচি। নিজেদের মতটি ছাড়া সমস্তই অশাস্ত্রীয়। নিজেদের আচার-ব্যবহার ভিন্ন জগতের সমস্ত আচার-ব্যবহারই কদর্য এবং হীন। এক কথায় নিজেরা ছাড়া আর কেহ মানুষই নয়। কালের সঙ্গে সঙ্গে যে নিয়মও বদলায়, এ সত্যের ইহারা কোন ধার ধারে না। তাই সময়োপযোগী কোন একটা নূতন পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা হইবামাত্রই ইহারা ভয়ে সারা হইয়া যায়। কাঁদো-কাঁদো হইয়া জানায়, শাস্ত্রের শ্লোকে খুঁজিয়া মিলিতেছে না, এবং প্রাণপণে বাধা দিয়া মনে করে, দেশের উপকার হইতেছে—শাস্ত্র বজায় হইতেছে। অথচ ইহারাই কি সমস্ত শাস্ত্র মানিয়া চলে? শাস্ত্রে আছে, রাক্ষস-বিবাহ। শাস্ত্রে আছে, অসুর-বিবাহ। শাস্ত্রে আছে, ক্ষেত্রজ সন্তানের বিধি। আধুনিক সমাজে এইগুলা সুরু হইয়া গেলে, ইহারাই কি ভাল মনে করে? অথচ কেন করে না, জিজ্ঞাসা করিলেও ঠিকমত জবাব দিতে পারে না। তখন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানারকম করিয়া বলিবার চেষ্টা করে, দেশাচার, নয়—তেমন আবশ্যকও নয়—ভাল নয়—মানুষের নৈতিক বুদ্ধি অনুমোদন করে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ, এ-কথা শাস্ত্রে

থাকে থাক্, আর একটা শাস্ত্রে উল্টা শ্লোকও ত আছে! গান্ধর্ব বিবাহ, ক্ষেত্রজ সন্তানাদি নিজেদের সংসারে যখন কোনমতেই পছন্দ করি না, তখন আর কেহ করিলেও যত পারিব তত গালি দিব।

'পছন্দ করি না' এইটাই আসল কথা। বাস্তবিক কোন শাস্ত্রই পুরুষে অধিকদিন মানিয়া চলে না, যদি না তাহা তাহাদের আন্তরিক অভিপ্রায়ের সহিত মিশ খায়। মিশ খাইলে, তখনই সেটা টিকসই হয়। অন্যথা, স্বয়ং ভগবান রাস্তায় দাঁড়াইয়া নিজের মুখে চেঁচাইয়া বলিয়া গেলেও হয় না। হইতে পারে, অবস্থা-বিশেষে এই শাস্ত্র কাহারও বা দুঃখ উপস্থিত করে, কিন্তু সাধারণ ইচ্ছার চাপে এ দুঃখ স্থায়ী হইতে ত পায়ই নাই, পরন্তু দুঃখ উৎকৃষ্টতর ধর্মের আকার ধরিয়া পরলোকে শত-গুণ সুখের আশ্বাস দিয়া পরিতৃপ্ত করিয়া যায়। পুরুষের ক্ষণিক দুঃখ ক্ষণিকেই শেষ হয়; কিন্তু চির-দুঃখ যাহাকে সহিতে হয়, সে নারী।

আমাদের দেশে পূজার্হা নারীর পূজার ব্যবস্থা দেখিয়াছি। তথাপি ইহাকে আদর্শ বলিয়া যে পুরুষ শ্লাঘা বোধ করেন, তাঁহাকে আমার কিছুই বলিবার নাই। বিদেশের ব্যবস্থাও দেখিয়াছি—সেখানেও ঐ ব্যাপার। চার-পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেকার লুপ্ত আইন-কানুনের একটা ধারায় সামাজিক ব্যবস্থা লেখা আছে—"If a wife hates her husband and says, 'thou art not my husband' into the river they shall throw her." আর একটা ধারায় লেখা আছে, "If a husband says to his wife, 'thou art not my wife' half a mina of silver he shall weigh out to her and let her go." অর্থাৎ স্ত্রী যদি স্বামীকে পছন্দ না করে, তাহা হইলে তাহাকে নদীতে নিক্ষেপ কর, আর পুরুষ যদি পছন্দ না করে, তাহা হইলে আধ মিনা ওজনের রূপা দিয়া বিদায় করিয়া দাও। কি সূক্ষ্ম বিচার! আধ মিনা রূপা কতখানি, অবশ্য সে-কথা বলিতে পারি না, কিন্তু যতই হৌক, জলে ডুবাইয়া মারার সঙ্গে নিক্তিতে

যে ওজন হইতে পারে না, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি। প্রাচীন বেবিলনের ১৩৭ হইতে ১৪৩ ধারায়ও ঠিক এইমত ব্যবস্থাই আছে। অথচ এই বেবিলন ইহুদিদিগের অপেক্ষা সহস্র-গুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। অল্পদিন পূর্বেও ইউরোপের নারী-সম্বন্ধে অনেকেই লিখিয়াছেন, "She was sold into slavery to her husband by her father and was treated with a different legal code from her brother"; "wife of the labourer a chattel of the estate, her life an unceasing drudgery" তবে কোথাও বা বাহিরের চাকচিক্য আছে স্বীকার করি, এবং কোথাও বা ভিতর হইতে সংশোধনের চেষ্টা হইতেছে —কিন্তু সে সংশোধনের ভার লইয়াছে নারী। পুরুষ উপযাচক হইয়া কোনদিন ভাল করিতে আসে নাই, কোনদিন আসিবেও না। যিনি বড় ভাল, তিনি দয়া করিয়া বই লিখিয়া গিয়াছেন, যেমন মিল, কনডোরসেট্। কিন্তু মুখ্যতঃ তাহা বই লেখার গৌরবের জন্যই। প্রাচীনকালে প্লেটোও রিপব্লিকে লিখিয়া গিয়াছেন, "This sex which we keep in obscurity and domestic work, is it not fitted for nobler and more elevated functions? Are there no instances of courage, wisdom, advances in all the arts? May hap these qualities have a certain debility, and are lower than in ourselves, but, does it follow that they are, therefore, useless to the country?" এ-লেখার সূক্ষ্ম বিচার করিতে চাহি না এবং 'may hap' কথাটারও ব্যাখ্যা করিতে চাহি না। তবে সৎ অভিসন্ধি যে ইহাদের একেবারেই ছিল না, এ-কথা বলিলেও অন্যায় বলা হইবে। কিন্তু বিশেষ কোন ফলও ইহাতে ফলে নাই—বোধ করি, সত্যকার প্রয়াস ছিল না বলিয়াই।

বই লেখা ছাড়া পুরুষ কোথাও যে নারীকে যথার্থ সম্মান দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অবগত নহি; তবে এ-কথা জানি যে, যদি কোন দেশে রমণী যথার্থ শ্রদ্ধা-সম্মান লাভ করিয়া থাকে ত সে শুধু

নিজের চেষ্টাতেই লাভ করিয়াছে। প্রাচীন মিশরে এই চেষ্টা একবার হইয়া গিয়াছিল এবং সেই চেষ্টার স্রোত রোম পর্যন্ত আসিয়া আঘাত করিয়াছিল। আমাদের এ-দেশেও একদিন এ চেষ্টা হইয়াছিল, যখন নারী বেদ রচনা করিবারও স্পর্ধা রাখিত। এখন তাহা স্পর্শ করিবার অধিকার পর্যন্ত তাহার নাই। যখন নারী পুরুষের মুখের দেবী সম্বোধন শুনিয়া গলিয়া পড়িত না, সে মুখের কথা কাজে পরিণত করিতে বাধ্য করিত, তখন ছিল নারীর মূল্য।

আর এখনকার দিনের একটা দৃষ্টান্ত দিই। একসময় এ-দেশে যখন বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে-বিপক্ষে ঘোরতর আন্দোলন উঠিয়াছিল, সে-সময় যাঁহারা বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে, তাঁহারা নানাবিধ সুযুক্তি কুযুক্তির মধ্যে এই একটা অভিনব যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন যে, অল্পবয়স্কা বিধবাদের পুনর্বিবাহ না হওয়াতেই বঙ্গদেশে কুল-ত্যাগিনীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং, বিধবা-বিবাহের অনুকূলে ইহাও একটা হেতু হওয়া উচিত। মোটের উপর, বিধবা-বিবাহ উচিত, কিংবা উচিত নয়, এ লইয়া উভয় পক্ষে তুমুল লড়াই চলিতে লাগিল, কিন্তু পুনর্বিবাহ না হওয়ার দরুণই যে বিধবারা কুল-ত্যাগ করে, এই কথাটা বিধবা-বিবাহের শত্রুপক্ষীয়েরাও অস্বীকার করিল না। অর্থাৎ পুরুষমাত্রেই মানিয়া লইল যে, হাঁ, কথা বটে! কুলত্যাগিনীর সংখ্যা যখন বাড়িয়াই চলিতেছে, তখন বিধবা ভিন্ন কে আর কুলত্যাগ করিতে সম্মত হইবে! সুতরাং কিরূপ বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করিলে, কিরূপ শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম-চর্চার মধ্যে সদ্য-বিধবাকে নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে পারিলে, কিরূপে তাহার নাক চুল কাটিয়া লইয়া বিশ্রী করিয়া দিতে পারিলে, এবং কিরূপ খাটুনির মধ্যে ফেলিয়া তাহার অস্থি-চর্ম পিষিয়া লইতে পারিলে, এই অমঙ্গলের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে। স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয়েই তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে লাগিলেন। আজও এ মীমাংসার শেষ হয় নাই। এখনও থাকিয়া থাকিয়া মাসিক পত্রে প্রবন্ধ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কি

করিলে সদ্য-বিধবাকে আটকাইয়া রাখিতে পারা যায়, এবং এতদর্থে পিতা-মাতারই বা কর্তব্য কি। বস্তুতঃ, সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পুরুষের এই ভয়টাই চোখে পড়ে যে, নারীকে আটকাইয়া রাখিতে না পারিলেই সে বাহির হইবার জন্য পা তুলিয়া থাকে। কেহ বলিলেন, 'বিশ্বাসং নৈব কর্তব্যম্', কেহ আর এক ধাপ চড়িয়া বলিলেন, 'অঙ্কে স্থিতাপি', কেহ বা ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া প্রচার করিলেন, 'দেবা ন জানন্তি'। বলা বাহুল্য, ইহাতে পূজার্হা নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় নাই এবং পুরুষের কোন সংস্কারের উপর যে এতগুলা বিধি-নিষেধ ডাল-পালা ছড়াইয়া বড় হইয়া উঠিতে পারিয়াছে, সে-সম্বন্ধেও বোধ করি দুই মত নাই।

বিধবা-বিবাহ ভাল কিংবা মন্দ, সে তর্ক তুলিব না। কিন্তু এ বিবাহ যদি শুধু এই বলিয়াই উচিত হয় যে, অন্যথা তাহাকে সুপথে রাখা শক্ত হইবে, তাহা হইলে আমি বলি, বিধবা-বিবাহ না হওয়াই উচিত।

কিন্তু কথাটা কি সত্য ? পুরুষ নির্বিচারে মানিয়া লইয়াছে, কিন্তু যাচাই করিয়া দেখিয়াছে কি, বিধবা বাহিরে আসিবার জন্য নিশিদিন উদ্যত হইয়াই থাকে কি না ? কথাটা প্রচার করিবার সময়, বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া লইবার সময়, একবারও সে মনে করিয়াছে কি, কি গভীর কলঙ্কের ছাপ সে নারীত্বের উপর বিনা-দোষে ঢালিয়া দিতেছে ? বিলাতের একজন বড় দার্শনিক বলিয়াছিলেন, দাস ব্যবসায় যেমন "sum of all villainy', বেশ্যাবৃত্তি তেমনি 'sum of all degradations.' আমি বিদেশের কথা বলিলাম, কারণ দেশের কথা তুলিতে সাহস হয় না। দেবতাদের মত এ-দেশের স্বর্গেও এঁরা থাকেন, এবং রাগ করিয়া শাপ-সম্পাত করিলে মুনি-ঋষিদের চেয়ে বড় কম ফলে না। যাহাই হৌক, বিদেশীর কথায়, এই এতবড় হীনতার মধ্যে ডুব দিয়া পড়িবার জন্যই কি নারী অহরহ উন্মুখ হইয়া থাকে এবং এতবড় পাশবিকতাই কি নারীর স্বাভাবিক চরিত্র ? পুরুষ তাহার গায়ের জোর লইয়া বলিবে, হাঁ'। নারী তাহার সঙ্কীর্ণ অভিমান লইয়া বলিবে, 'না'। বাস্তবিক

যাচাই না করিয়া শুদ্ধ একটা কাল্পনিক উত্তর দিবার চেষ্টা করিলে তর্কই চলিতে থাকিবে। কিন্তু যাচাই করিয়া দেখিলে কি জবাব পাওয়া যায়, তাহাই দেখাইতেছি। বারো-তেরো বৎসর পূর্বে জনৈক ভদ্রলোক এই বাঙলাদেশে কুলত্যাগিনী বঙ্গরমণীর ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছিলেন। তাহাতে বিভিন্ন জেলার বহুসহস্র হতভাগিনীর নাম, ধাম, বয়স, জাতি, পরিচয় ও কুলত্যাগের সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ লিপিবদ্ধ ছিল। বইখানি গৃহদাহে ভস্মীভূত হইয়াছে—বোধ করি, ভালই হইয়াছে—সুতরাং কেহ সঠিক প্রমাণ চাহিলে দিতে পারিব না সত্য, কিন্তু ইহার আগাগোড়া কাহিনীই আমার মনে আছে। আমি হিসাব করিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম যে, এই হতভাগিনীদের শতকরা সত্তর জন সধবা। বাকী ত্রিশটি মাত্র বিধবা। ইহাদের প্রায় সকলেরই হেতু লেখা ছিল, অত্যধিক দারিদ্র্য ও স্বামী প্রভৃতির অসহনীয় অত্যাচার-উৎপীড়ন। সধবাদিগের প্রায় সবগুলিই নীচ-জাতীয়া, আর বিধবাগুলির প্রায় সবগুলিই উচ্চ-জাতীয়া। নীচ-জাতীয়া সধবারা এই বলিয়া জবাবদিহি করিয়াছিল যে, খাইতে-পরিতে তাহারা পাইত না—দিনে উপবাস করিত, রাত্রে স্বামীর মার-ধোর খাইত। সৎকুলের বিধবারাও কৈফিয়ৎ দিয়াছিল, কেহ-বা ভাই ও ভ্রাতৃজায়ার, কেহ-বা শ্বশুর-ভাশুরের অত্যাচার আর সহ্য করিতে না পারিয়া এই কাজ করিয়াছে। ইহাদের সকল কথাই যে সত্য তাহা নয়, তথাপি সমস্ত ব্যাপারটা একটু মনোযোগের সহিত দেখিলেই চোখে পড়ে—এমনিই বটে !

ভদ্র-কুলের বিধবারা স্বামীর অবর্তমানে যেমন নিরুপায়, নীচ-জাতীয়া সধবারা স্বামী বর্তমানে ঠিক তেমনি নিরুপায় ; কিন্তু তাহাদের বিধবার অবস্থা ভাল। কারণ, নীচ-ঘরের স্ত্রীলোকেরা বিধবা হইলে আর বড় কাহাকেও মিথ্যা ভয় করিয়া চলে না—অনেকটা স্বাধীন। তাহারা হাট-বাজারে যায়, পরিশ্রম করে, ধান ভানে, প্রয়োজন হইলে দাসীবৃত্তি করে। সুতরাং সৎ উপায়ে জীবিকা-নির্বাহ করা তাহাদের পক্ষে সহজ,

—তাহারা তাই করে, কুলত্যাগ করিবার আবশ্যক হয় না, করেও না। অথচ তাহাদের সধবার পক্ষে সে পথ বন্ধ। স্বামী বিদ্যমানে সে না পায় দুঃখ-মেহন্নত করিতে, না পায় খাইতে-পরিতে। স্বামী ভাত-কাপড় যোগাইতে পারে না, যাহা পারে তাহা শুধু মার-ধোর করিয়া শাসন করিতে। ঐ যে কথা আছে, "ভাত-কাপড়ের কেউ নয়, কিল মারবার গোঁসাই"—কথাটা বাঙলার নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে যে কতদূর সত্য, এবং কতবড় দুঃখেই যে ছড়াটার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। আবার ভদ্র ঘরের বিধবার অবস্থা ঠিক নীচ-জাতীয়া সধবার অনুরূপ। তাহাকেও স্বাধীনভাবে কায়িক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে দেওয়া হয় না, কারণ তাহাতে পিতৃ-কুলের বা শ্বশুরকুলের মর্যাদাহানি হয়, অথচ বাড়ীর মধ্যে ভদ্র-বিধবার অবস্থা কাহারো অবিদিত নাই। আমিও ইতিপূর্বে তাহা একাধিকবার বলিয়াছি। অতএব দেখিতে পাওয়া যায়, শতকরা সত্তর জন হতভাগিনী অন্ন-বস্ত্রের অভাবে এবং আত্মীয়-স্বজনের অনাদর, উপেক্ষা, উৎপীড়নেই গৃহত্যাগ করে—কামের পীড়নে করে না, এবং এইজন্যই কুলত্যাগিনীদের মধ্যে বিধবা অপেক্ষা সধবার সংখ্যাই অধিক। অথচ, কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়াই পুরুষ ধরিয়া লইয়াছে, কুলত্যাগ শুধু বিধবাতেই করে; অতএব অদ্ভুত বিধি-নিয়োগের দ্বারা তাহাকে শাসন করাই ঠিক কাজ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুলত্যাগ যে পতিযুক্তারাই অধিক করে, এবং তাহা পুরুষেরই অত্যাচার-উৎপীড়নের ফলে, এ-কথা কোন্ পুরুষ স্বীকার করিতে সম্মত হইবে? এদিকে পুরুষ যেমন দারিদ্র্য ও কহনাতীত উৎপীড়নে নারীর স্বাভাবিক শুভ-বুদ্ধিকে বিকৃত করিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে, অন্যদিকে তেমনি তাহাকেই আপাতমধুর সুখের প্রলোভনে প্রতারিত করিয়া ঘরের বাহির করিয়া আনে। পুরুষের ভয় নাই, সে যদিচ্ছা সুখ ভোগ করিয়া ফিরিয়া যাইতে পারে। তাই সে ফিরিয়া গিয়া দিন-দুই ঘরের কোণে অনুতপ্তভাবে বসিয়া থাকে। আত্মীয়-স্বজন তাহার পুনরাগমনে

খুশী হইয়া সাহস দিয়া বলিতে থাকে, "তার আর কি! ও অমন হইয়া থাকে,—পুরুষের দোষ নেই। এসো বাহিরে এসো।" সেও তখন হাসি-মুখে বাহির হয়, এবং গলা বড় করিয়া প্রচার করিতে থাকে, নারীর পদস্খলন কিছুতেই মার্জনা করা যাইতে পারে না।

ঠিক ত! যে কারণেই হোক, যে নারী একটিবার মাত্রও ভুল করিয়াছে, হিন্দু তাহার সহিত কোন সংশ্রব রাখে না। ক্রমশঃ ভুল যখন তাহার জীবনে পাপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, দিন দিন করিয়া যখন তাহার সমস্ত নারীত্ব নিঙড়াইয়া বাহির হইয়া যায়—যখন সে বেশ্যা, তখন আবার তাহার অভাবে হিন্দুর স্বর্গও সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না। এতই তাহার প্রয়োজন। দেশের লোক আদর করিয়া যেমন শ্রীকৃষ্ণের 'কালো সোনা', 'কালো মাণিক' প্রভৃতি অষ্টোত্তর-শতনাম দিয়াছিল, সংস্কৃত সাহিত্যেও বোধ করি বেশ্যার আদরের নাম তার চেয়ে কম নয়। এই সকল হইতেই বুঝিতে পারা যায়, স্বার্থপরতা ও চরিত্রগত পাপ-বুদ্ধি নর-নারী কাহার অধিক, এবং সমাজ হইতে এই পাপ বহিষ্কৃত করিতে হইলে শাস্ত্রের কড়া আইন-কানুন কাহার সম্বন্ধে অধিক থাকা উচিত, এবং সামাজিক জীবন বিশুদ্ধ রাখা উদ্দেশ্য হইলে নর-নারী কাহাকে অধিক চোখে চোখে রাখা কর্তব্য, এবং শাস্তি কাহাকে অধিক দেওয়া আবশ্যক। অথচ, সমাজ নারীর ভুল-ভ্রান্তি এক-পাইও ক্ষমা করিবে না, পুরুষের ষোল-আনাই ক্ষমা করিবে। হেতু? হেতু শুধু গায়ের জোর; হেতু শুধু সমাজ অর্থে 'পুরুষ'—'নারী' নয় বলিয়া। কাজটা ঘৃণার কাজ, তাই পুরুষ নারীকে ঘৃণা করে। তাহাকে ঘৃণা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু নারীকে সে অধিকার দেওয়া হয় নাই। পুরুষ যতই ঘৃণ্য হউক, সে স্বামী। স্বামীকে ঘৃণা করিবে স্ত্রী কি করিয়া? শাস্ত্র যে বলিতেছেন, তিনি যেমনই হউন না, সতী স্ত্রীর তিনি দেবতা, এবং এই দেবতাটির মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার পদপঙ্কজ ক্রোড়ে করিয়া অনুগমন করা আবশ্যক। অন্ততঃ এ-যুগে তাঁহারই পদপঙ্কজ স্মরণ করিয়া জীবন্মৃত হইয়া থাকাতেই যথার্থ নারীত্ব।

কেহ কেহ বৈজ্ঞানিক তর্কের অবতারণা করিয়া বলেন, ভবিষ্যৎ বংশধরের ভাল-মন্দ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে নারীর ভুল-ভ্রান্তিতেই ক্ষতি হয়, পুরুষের হয় না। অথচ চিকিৎসকেরাই বিদিত আছেন, কত কুল-স্ত্রীকেই না অসতীর পাপ ও কুৎসিত ব্যাধিযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, এবং কত শিশুকেই না চিররুগ্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এবং সারা-জীবন ধরিয়া পিতৃ-পিতামহের দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে থাকে। অথচ, শাস্ত্র এ-সম্বন্ধে অস্পষ্ট, লোকাচার নির্বাক্, সমাজ মৌন। তাহার প্রধান কারণ এই যে, শাস্ত্রবাক্যগুলা সমস্ত প্রায় ফাঁকা আওয়াজ। পুরুষের ইচ্ছা এবং অভিরুচিই আসল কথা, এবং তাহাই সমাজের যথার্থ সুনীতি। মনু, পরাশর, হারীত—মিথ্যাই ইহাদের দোহাই পাড়া! এই যে পুরুষ চোখের উপরেই অন্যায় অধর্ম করিবে, অথচ সতীত্ব বজায় রাখিবার জন্য তাহার স্ত্রী কথাটি মাত্র বলিতে পারিবে না (শাস্ত্র-বাক্য !), এমন কি, তাহার বীভৎস জঘন্য ব্যাধিগুলা পর্যন্ত জানিয়া শুনিয়া নিজ-দেহে সংক্রমিত করিয়া লইতে হইবে, এর চেয়ে নারীর অগৌরবের কথা আর কি হইতে পারে ?

তথাপি অন্যান্য দেশে আছে divorce. তথাকার রমণীর কতকটা উপায় আছে, কিন্তু আমাদেব এই যে স্বয়ং-ভগবানের দেশ, যে-দেশের শাস্ত্রের মত শাস্ত্র নাই, ধর্মের মত ধর্ম নাই, যেখানে জন্মিতে না পারিলে মানুষ মানুষই হয় না, সে-দেশের নারীর জন্য এতটুকু পথ উন্মুক্ত রাখা হয় নাই। এ-দেশের পুরুষ রমণীকে হাত-পা বাঁধিয়া ঠেঙ্গায়, সে বেচারী নড়িতে চড়িতে পারে না। তাই পুরুষ বাহিরে আস্ফালন করিয়া বলিতে পায়, এ-দেশের নারীর মত সহিষ্ণু জীব জগতের আর কোথায় আছে ?

নাই তাহা মানি ; কিন্তু যে-জন্য নাই, সে কারণটা কি পুরুষের বড়াই করিবার মত ? বিদেশের সংবাদপত্রে যাই খবর বাহির হয়, অমুক অমুকের সহিত স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ ছেদ করিবার জন্য মকদ্দমা রুজু করিয়াছে, স্বদেশী কাগজওয়ালার তখন আর আহ্লাদ ধরে না—চেঁচাইয়া সে গাঁ ফাটাইতে থাকে, দেখ, চেয়ে দেখ, বিলাতি সভ্যতা !

তাহাদের মনের ভাব এই যে, পরের দোষগুলা প্রচার করিতে পারিলেই নিজেদের গুণগুলা মাথা নাড়া দিয়া উঠিবে। Divorce জিনিসটা যে বাঞ্ছনীয় নয়, সে-কথা তাহারাও বোঝে, কিন্তু মার খাইয়া তাহারা চুপ করিয়া থাকিতে পারে না—মারামারি করে। মারামারি জিনিসটা নিঃশব্দে হইবার বস্তু নয়, তাই সে-কথা বাহিরের লোকে শোনে, এবং তাই শত্রু-পক্ষ দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া আকুল হইয়া উঠিবার অবকাশ পায়। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যে-কারণে ও-অঞ্চলে এ মকদ্দমা রুজু হয়, সে কারণ কি হিন্দুর ঘরে ঘটে না? আমার বিশ্বাস, যে অতিবড় নির্লজ্জ, সেও বোধ করি, না বলিবে না। যদি তাই হয়, তবে আহ্লাদ করিবার হেতু কোন্‌খানে থাকে? মকদ্দমাই কি আসল বস্তু, কারণটা কিছু নয়? ও-দেশেও একসময় divorce ছিল না, কিন্তু মধ্যযুগের অকথ্য হীনতার মধ্যে পড়িয়াই একসময় তাহাদের চৈতন্য হইয়াছিল। Church's irrational rigidity as regards divorce tended to foster disorder and shame. Sexual disorder increased. Woman became cheaper in the esteem of men and the narrowing of her interest to domestic work, the desire to please men proceeded apace. শাস্ত্রের এই গোঁড়ামি নারী জাতিকে যে কত দুঃখে, কত নীচে নামাইয়া আনিয়াছিল, আচার্য K. Pearson তাঁহার Ethic of Free Thought গ্রন্থে অনেকরকমে তাহার আলোচনা করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন,—নারী-মাত্রকেই একবার তাহা পড়িতে অনুরোধ করি।

কিন্তু তাই বলিয়া আমাকে যেন এমন ভুল না বুঝা হয় যে, আমি divorce বস্তুটাকেই ভাল বলিতেছি। মারামারি জিনিসটাও ভাল জিনিস নয়; সমাজের মধ্যে ওটা ঘটিতে থাকে, এ কামনা কেহ করে না। কিন্তু স্ত্রী-ত্যাগ বলিয়া একটা ব্যাপার যখন আমাদের মধ্যে আছে, তখন উভয় পক্ষেই ও-জিনিষটা কেন থাকা উচিত নয়, তাহা বলিতে পারি না।

অবশ্য পুরুষ এ-কথা কিছুতেই মানিবে না যে, তাহার মত ত্যাগ করিবার ক্ষমতা তাহার স্ত্রীরও থাকে। কিন্তু কেন থাকিবে না, কেন অন্যান্য দেশের নারীর মত এই ন্যায্য অধিকার তাহাকে দেওয়া হইবে না, ইহারও সে কোন সঙ্গত কারণ নির্দেশ করিতে পারিবে না—শুধু জ্বলিয়া উঠিয়া জবাব দিবে, "দূর,—এও কি একটা কথা!"

এটা কথা নয়, কারণ তাহার অপরাধ করিবার অবাধ স্বাধীনতা খর্ব হয়, ইহা সে চাহে না। বিশেষ করিয়া এ-দেশের পুরুষ যে নিজে কাপুরুষ, ভীরু—অন্যান্য দেশের পুরুষের তুলনায় যে নারীর মতই নিরুপায়, যে নারীর কাছে পুরুষ বলিয়া পরিচয় দিবার যথার্থ ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত, সে কাপুরুষের মত তাহার অপেক্ষা দুর্বল ও নিরুপায়কেই পীড়ন করিয়া কর্তৃত্ব করার আনন্দ উপলব্ধি করিতে চাহিবে, তাহা স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপার নহে। সে যে মরিয়া গেলেও স্বেচ্ছায় এ অধিকারের এক পাইও ছাড়িয়া দিতে চাহিবে না, তাহা বুঝিতে পারা কঠিন নয়। সে যে শাস্ত্র আওড়াইবে, বিজ্ঞানের দোহাই পাড়িবে, সুনীতির ছদ্ম অভিনয় করিবে, তাহাও জানা কথা। কিন্তু নারীরও বুঝিয়া দেখার সময় হইয়াছে। যে পুরুষ স্ত্রীকে পথে রক্ষা করিতে পারিবে না জানিয়াই শাস্ত্র বানাইয়াছে, 'পথি নারী বিবর্জিতা', তাহার শাস্ত্রের ততটুকু মূল্যই দেওয়া উচিত এবং ইহাই সুবিচার।

আমার মনে হইতেছে, আমার কথাগুলা পুরুষদিগের ভাল লাগিতেছে না, এবং অন্তঃপুরেও এগুলা পৌঁছায়, ইহাও তাহাদিগের ইচ্ছা হইতেছে না। কিন্তু যে-দেশে অর্থশূন্য অত্যাচার-অবিচারের একটা সীমা পর্যন্ত নাই, সে-দেশে কোন না কোন দিন নারী কারণ জানিতে চাহিবেই—পুরুষ তাহা পছন্দ করুক, আর নাই করুক। ফ্রান্সের নেপোলিয়নও একদিন ম্যাডাম কনডোরসেটকে বলিয়াছিলেন, I do not like woman to meddle with politics. তাহাতে ম্যাডামও জবাব দিয়াছিলেন, You are right General, but in a country where

it is the custom to cut off the heads of women, it is natural that they should wish to know the reason, why.

মানুষ যখন মানুষ হইয়া উঠে নাই, তাহার পূর্বেও সে যে কার্য-কারণের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের আভাস পাইয়াছিল, আজকাল পণ্ডিতেরা তাহা আর অস্বীকার করেন না। সে যখন শামুক ছিল, তখনই অকস্মাৎ মেঘের ছায়ায় সূর্যের আলো মলিন দেখিয়া ভয়ে মুখ বুজিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল—সে টের পাইয়াছিল, ছায়া শুধু ছায়া নয়, তার সঙ্গে আর কিছু একটা আসিতেছে। যে আসিতেছে সে প্রবল, সে সন্নিকটবর্তী হয়ত, অপকার করিবে এই তার ভয়। ছায়ার কারণ দেখিয়া সে কার্য অনুমান করিয়াই দুর্গদ্বার আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেই জীবের ক্রমোন্নতি ব্যাপার জগতে সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইবার পরে মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় যতগুলি পুস্তক বাহির হইয়াছে, তাহাতে এই একটা কথা পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইয়াছে যে, মানুষের বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি ঠিক তাহার শরীরের মতই ধীরে ধীরে উন্নত হইয়াছে। সুতরাং সাধারণ পশু অপেক্ষা যদিচ সব বিষয়ে মানুষ খুবই বড় হইয়াছে, তবুও একটা সম্পর্কের টান যে রহিয়াই গিয়াছে, তাহাকে কোনমতেই না করিবার পথ নাই। এই পার্থক্য পরিমাণগত, প্রকৃতিগত নহে। সেই সত্যটা বুঝিয়া লইয়া যদি সন্ধান করা যায়, যাহাকে আমরা পশু বলি, তাহাদের মধ্যে নারীর মূল্য আছে কি না? দেখা যায় আছে। দুটো সিংহ প্রাণান্তকর যুদ্ধ করিতে থাকে, সিংহীটা চুপ করিয়া লড়াই দেখে; যে জয়ী হয়, ধীরে ধীরে তাহার সহিত প্রস্থান করে, একবার ফিরিয়াও চাহে না অপরটা মরিল কি বাঁচিল। অতঃপর এই সিংহ-মিথুন কিছুকাল একসঙ্গে বাস করে, তার পর সিংহী যখন আসন্নপ্রসবা তখন ইহারা পৃথক্ হয়—সন্তান লালন-পালন ও রক্ষা করার ভার একা জননীর উপরই পড়ে। সিংহ মহাশয় সন্তানের কোন দায়িত্বই গ্রহণ করেন না, বরঞ্চ সুবিধা পাইলে সংহার করিবার চেষ্টাতে ফিরিতে থাকেন। বানর ও গরিলার মধ্যেও

প্রায় অনুরূপ প্রথা দেখা যায়। ইহাতে লাভ এই হয় যে, এমন জাতি ধ্বংসের মুখেই অগ্রসর হইতে থাকে। ইতিমধ্যে অনুকূল কারণ না থাকিলে, গহন-বনে বা অতি নিভৃত পর্বত-কন্দরে সন্ততি-রক্ষার আশ্রয় না মিলিলে, আমরা বোধ করি এই পশুগুলোর নাম পর্যন্তও জানিতে পারিতাম না—তাহারা বহুপূর্বেই নিঃশেষ হইয়া যাইত। এই ঘটনাটা একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই একটা আশ্চর্য আত্মঘাতী ব্যাপার চোখে পড়ে। এই পশু বংশবৃদ্ধির নৈসর্গিক তৃষ্ণা ও উত্তেজনার বশে লড়াই করিয়া প্রাণ দেয়, অথচ ইহারাই শেষ সফলতার দিকে একবার ফিরিয়াও দেখে না। তা ছাড়া আরো একটা কথা এই, যে জন্তুটা প্রাণ দেয়, সে নিজের অসহ্য প্রবৃত্তির যূপকাষ্ঠেই কণ্ঠচ্ছেদ করে, নারীর জন্য নারীর পদমূলে আত্মবিসর্জন করে না। অতএব মূল্য যদি এখানে কিছু থাকে ত সে তাহার নিজের প্রবৃত্তির, নারীর নয়। এই দুটো কথা মনে রাখিয়া, পশুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া, মানুষের রাজ্যে পদার্পণ করিয়াও এই ব্যাপারের অসদ্ভাব ঘটে না, এবং আজ এই পাশব প্রবৃত্তিকে নিজেদের সমাজে যত ইচ্ছা বড় বলা হউক না কেন, এবং নর-নারীর স্বর্গীয় প্রেমের জন্মভূমি যত বড় স্বর্গেই নির্দেশ করা থাক্ না কেন, তাহা সত্য নয়, নিছক কল্পনামাত্র। আমি গোটা-দুই দৃষ্টান্ত দিয়া তাহাই বলিতেছি। কিন্তু বলিবার পূর্বে এ-কথাটাও বিশেষ করিয়া বলিয়া রাখি যে, ক্রমোন্নতির ফলে নর-নারীর সহস্রমুখী স্নেহ-প্রেমের যে মধুর চিত্র বাল্মীকির হৃদয়ে ব্যাসের হৃদয়ে, কালিদাসের হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়া বিশ্বজগতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহা স্বর্গীয় বস্তু অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয়। নীচ-কূলে জন্ম বলিয়া আর তাহাকে উপেক্ষা করা যায় না। কোহিনুরকে পাথুরে কয়লার খোঁটা দিয়া, উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানকে ভূতের ভয়ের লজ্জা দিয়া, তাহার যথার্থ মূল্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা কিছুতেই চলে না। এ-সকল আমি জানি এবং জানি বলিয়াই ইহার জন্মের কথা তুলিয়াছি, এবং ধীরে ধীরে এই মূল্য যে আজ যথার্থ কত বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা মানবের

আদিম যুগের ইতিহাসের দিকে চাহিয়া পরিমাণ করিতে আহ্বান করিতেছি। কি করিয়া পাশব বৃত্তি অদ্ভুত অনির্বচনীয় প্রেমে, পাতিব্রত্যে রূপান্তরিত হইয়াছে, কি করিয়া নরের প্রবৃত্তির মানদণ্ডে প্রথম পরিমিত নারীর মূল্য একদিন ভাবুকের হৃদয়ে অপরিমেয় দেবতার মূল্যে এক আসন পাতিয়াছে এবং সেই তাহার যথার্থ স্থান কি-না, তাহা দেখিতে গেলে সাহসপূর্বক গোড়া হইতে দেখিবার চেষ্টা করা উচিত। চোখ বুজিয়া যাহা অভিরুচি হয় বলিব, যাহা খুশী শাস্ত্র বানাইব, যথা ইচ্ছা দাম দিব, এ শুধু বলবানের গায়ের জোরে করা যায়—সত্যের জোরে, ন্যায়ের জোরে করা যায় না। মূল্যের একটা নৈসর্গিক নিয়ম আছে, সেও যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় ও একমাত্র নিয়মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, কৃত্রিম উপায়ে তাহাকে বাড়াইলে কমাইলে শেষ পর্যন্ত যে সুফল ফলে না, সেন-রাজার কৃত্রিম কুলীন-করা বামুনের দাম যে ক্রমাগত বাড়িয়াই চলে নাই, পেরুর ইঙ্কার জোর-করা আভিজাত্য যে তাহাকে ধ্বংস না করিয়া ছাড়ে নাই, এই সত্য যে-কোন লোক বা যে-কোন জাতি, আলস্য অজ্ঞানতা বা দম্ভের জোরে অস্বীকার করিবে, সে-ই যে কক্ষভ্রষ্ট উপগ্রহের মত অনিবার্য মৃত্যুর পথেই দিন দিন ধাবিত হইবে, তাহাতে আর সংশয়মাত্র নাই।

এই সত্য সুস্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়, জগতের আদিম মানব-জাতির রীতি-নীতির দিকে চাহিয়া দেখিলে। ইতিপূর্বে আমি মুখ্যতঃ সভ্য জাতির সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছি; তাহারা নারীর মূল্য কোথায় ধার্য করিয়াছে, তাহাই নিরূপণ করিবার প্রয়াস করিয়াছি। এইবার দেখিতে চাহি, যে মানুষ এখনও সুসভ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই, তাহারা নারীর মূল্য কি দিয়াছে।

মূল্য কি করিয়া দেওয়া যায়? আমেরিকার অসভ্য চিপিওয়ানদের সম্বন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সর লিখিয়াছেন, "men wrestle for any woman to whom they were attached." বেশ কথা। আবার ইহাদের সম্বন্ধেই হার্ন সাহেব শত বৎসর পূর্বে উত্তর-মহাসমুদ্র ভ্রমণ-কাহিনীর

একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন, ইহারা নিজের জননীকে (বিমাতা নয়) সুন্দরী বিবেচনা করিলে, পিতার নিকট হইতে বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়া বিবাহ করে, এবং ইহাদের সম্বন্ধেই হার্‌বার্ট স্পেন্সরের (Descriptive Sociology) সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে একস্থানে লেখা আছে, "in the Chippewayan tribes divorce consists of neither more nor less than a good drubbing and turning the woman out of doors." অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা "fight with spears for possession of a woman," আমেরিকার ডগ্‌রিব জাতিরা "fight just like stags." আমেরিকার মন্ত্র জাতিরা "fight like natural enemies." অথচ ডগ্‌রিব জাতিরা স্ত্রীকে "use like beast of burden" এবং এক একজন মন্ত্র জীবনে ৪০।৫০-বার বিবাহ করে। অতএব দেখা যায়, এই অসভ্যদিগের স্ত্রী-লাভের যুদ্ধও বন্য পশুর নৈসর্গিক প্রবৃত্তি। ত্যাগ করার প্রয়োজনও ঠিক তাহাই। নারীর মূল্য এখানে এক কাণাকড়িও নাই। নারীও তেমনি। স্বামী যুদ্ধে শেলবিদ্ধ হইয়া ভূপতিত হইবামাত্রই তাহার পতিব্রতা স্ত্রী নিজের জিনিস-পত্র মাথায় তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে বিজেতার অনুসরণ করে। এখানে বন্য পশুর মত নর-নারীর বিশেষ কোন সম্পর্কও নাই। উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতু যখন নিজের জননীকে অপরিচিত ব্রাহ্মণের দ্বারা বলপূর্বক আকর্ষিত হইতে দেখিয়া পিতাকে প্রশ্ন করিয়াছিল যে, মাকে কোথায় লইযা যাইতেছে ? ইহাও সমাজের সেই অবস্থা। এই অবস্থায় স্ত্রীলোকমাত্রেই পুরুষের সম্পত্তি—যে যতক্ষণ জোর করিয়া দখল রাখিতে পারে, ততক্ষণই। আবার ভাল না লাগিলে ছাড়িয়া দেয়—ভাবটা, যাও চরিয়া খাও। ইহার পরের অবস্থা পলিনেসিয়া, নিউ কালিডোনিয়া এবং ফিজি দ্বীপে অসভ্যদিগের মধ্যে পাওয়া যায়। স্ত্রী-লাভের জন্য ইহারা লড়াই করে এবং নিজের প্রাণ বিপদাপন্ন করিয়াও যাহাকে পছন্দ হয় তাহাকে ঘরে আনে ; কিন্তু পছন্দ গত হইবার পরে, অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি বিমুখ হইলে আর তাড়াইয়া দেয় না,—এডমিরাল ফিজরয়, হম্‌বোল্ট, উইল্কেস প্রভৃতি অনেকেই

বলিয়াছেন, মারিয়া খাইয়া ফেলে। যাক, ইহাকে নিতান্ত মন্দ ব্যবস্থা বলা যায় না। তাহার পরের অবস্থা—যখন হইতে স্ত্রীলোক সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে—স্পেন্সর সাহেবের Principles of Sociolgy হইতে তুলিয়া দিতেছি—a Chippewayan chief said to Hearne, "women were made for labour, one of them can carry or haul as much as two men can do." ঐ গ্রন্থে ব্যারো সাহেবের Interior of Southern Africa হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, "The woman is her husband's ox, as a kaffir once said to me —she had been bought, he argued and must therefore labour." স্টার সাহেব লিখিয়াছেন, a kaffir who kills his wife can defend himself by saying, "I have bought her once for all." একটু সামান্য উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় অসভ্য মাপুচি জাতির মধ্যে,—"a Mapuchi widow by the death of her husband becomes her own mistress unless he may have left grown-up sons by another wife, in which case she becomes their common concubine, being regarded as a chattel naturally belonging to the heirs of the estate." জগতের অধিকাংশ স্থানে ইহাই স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক অবস্থা। Old Testament-এর লেভির চিনাদের বিধবা পুত্রবধূকে অপরের কাছে বিক্রয়-করা, (কন্যার পিতা বিক্রয়-লব্ধ মূল্য ফিরাইয়া দিতে অক্ষম হইলে) হিন্দুর বিধবা পুত্রবধূর উপর শ্বশুরকুলের সম্পূর্ণ অধিকার, ইত্যাদি সম্পত্তিবাচক। Vera Paz-এর আদিম অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে ইনিই লিখিয়াছেন, "the brother of the deceased at once took her (the widow) as his wife even if he was married, and if he did not, another relation had a right to her." অর্থাৎ সম্পত্তি কিছুতেই বেহাত হইতে পায় না। সংসারে শতকরা নব্বইটা জাতির সম্বন্ধে কম-বেশী এই উক্তি বর্ণে বর্ণে প্রয়োগ করা যায়। আমেরিকার বোষ্টন সহরের মত স্থানেও ১৮৫০ অব্দ

পর্য্যন্ত নারীর স্থান কোথায় ছিল,—History of Women's Suffrage হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—উক্ত গ্রন্থে নারী বিবাহ করিবার পূর্বে তাহার সমস্ত সম্পত্তি ভাবী স্বামীকে লিখিয়া দিবার পরেও "she was not a person." "not recognised as a citizen," "was little better than a domestic servant," "by the English common law her husband was her lord and master." "he could punish her with a stick," "the common law of the state of Massachusets held man and wife to be one person, but that person was the husband," "she had no personal rights, and could hardly call her soul her own" অথচ আমেরিকার নারীজাতির আশ্চর্য স্বাধীনতার কথা কতই না শোনা যায়। সে-দেশেও এ-দেশের মত লাঠিবাজি ছিল এবং নালিশ করিয়াও প্রতিকার হইত না।

এইখানে একটা প্রশ্ন মনে উঠে—সংসারে মানব-জাতির কোন্ অবস্থায় নারীর উপর প্রথম নির্যাতন সুরু হইয়াছিল? মানুষ যখন পশুর মত ছিল, তখন হইতে, না কতক মানুষের মত হইবার পর হইতে? এ-সম্বন্ধে কোন সমাজতত্ত্ববিদই ঠিক কিছু বলিতে পারেন না। পারিবার কথাও নয়। কারণ, প্রত্যেক জাতির মধ্যেই, তিনি সুসভ্যই হৌন, আর অসভ্যই হৌন, নর-নারীর সম্বন্ধটা এতই জটিল, এতই রহস্যে ঢাকা যে, বাহিরের লোকের বাহির হইতে দেখিয়া কিছুতেই তাহা ঠিক করিয়া বলিবার যো নাই। লেটুর যখন প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, পৃথিবীর সমস্ত অসভ্যেরাই নারী-জাতিকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দেয়, তখন তিনি নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়াই বলিয়াছিলেন, এবং তখন অনেকেই সে-কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন,—কিন্তু সম্প্রতি অনেক পণ্ডিতই তাহাতে ধীরে ধীরে আস্থাশূন্য হইয়া পড়িতেছেন। বস্তুতঃ, নর-নারীর সম্বন্ধটা কিছুতেই এমন হইতে পারে না, যাহাতে extreme and unmitigated oppression constantly subjected to unimaginable cruelty and violence by the savage

খাঁটি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায়। এমন হইলে সংসারে মানব-জাতিই লোপ পাইত। এই সত্যটা সমস্ত আলোচনার মধ্যে মনে করিয়া না রাখিলেই ভুল হইবে। তবে তাঁহারও কথাটা যে বারো আনা সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপরন্তু Haddon সাহেব যে জোর করিয়া তাঁহার Head Hunters গ্রন্থে বলিয়াছেন, ' by no means down-trodden or ill-used" সে-কথাটাও নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। যদিও তাঁহার এই কথাটার অনুকূলে কয়েকটা অসভ্য জাতির মধ্যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—যথা, ভারতের খাসিয়া রমণীরা বিরক্ত হইলে স্বামীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। নিকারাগুয়া ও টাহিটির স্ত্রীলোকেরাও স্বামীকে তাড়াইয়া দিয়া পুনরায় বিবাহ করে। আপাচ জাতিরা লড়াইয়ে হারিয়া আসিলে, স্ত্রীরা স্বামীদের ঘরে ঢুকিতে দেয় না। ডায়েক যুবকেরা এবং আমাজনের পাশীরা যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইতে না পারিলে বিবাহ করিতে পায় না। নর-মাংসাহারী কারিব জাতিরা পুরুষ মারিয়া খাইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের মাংস খাইতে পায় না। আরবদেশে শিখেরা স্ত্রীলোকের সুমুখে দাঁড়াইয়া তীব্র চাবুকের আঘাত দাঁত বাহির করিয়া সহ্য করিতে না পারিলে যুবতীর হৃদয় অধিকার করিতে পারে না—এবং আরো কয়েকটা জাতির মধ্যে—যথা, সুমাত্রা দ্বীপের বাটা প্রদেশে, আফ্রিকার সুবর্ণ উপকূলের নিগ্রোদের মধ্যে, আমেরিকার পেরুর অসভ্য জাতির মধ্যে এবং আরও কয়েকটা আদিম জাতির মধ্যে, বোধ করি আমাদের দেশের টোডাদের মধ্যেও সম্পত্তির উত্তরাধিকার রমণীর দিক দিয়াই হয়, পুরুষের দিক দিয়া হয় না। এ-সকল উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও রমণীরা চিরদিন যে নিপীড়িত হইয়াই আসিতেছে, তাহা সহস্র প্রকারের উদাহরণ দিয়া প্রমাণ করিতে পারা যায়। রমণীরা যে সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইত, তাহা ইতিপূর্বে অনেক প্রকারে বলিয়াছি, এবং এইজন্যই সম্পত্তির উত্তরাধিকার নারীর দিক দিয়াই আসিয়াছিল। একটা স্ত্রীকে লইয়া চার-পাঁচবারেরও অধিক কাড়াকাড়ি হইয়া যাইত, সুতরাং তাহার

গর্ভের সন্তান যে কোন্ বংশের তাহা স্থির করিবার উপায় ছিল না। এই হেতুই নিজের স্ত্রীর সন্তান বিষয় পাইত না, বিষয় পাইত ভগিনীর সন্তান। তাহাকে লইয়াও যে কাড়াকাড়ি হইত না তাহা নহে। কিন্তু হাজার কাড়াকাড়ি হইয়া গেলেও, ভগিনীটি যে অন্ততঃ নিজের বংশের এবং তাহার গর্ভের সন্তান যে কতকটা নিজের বংশেরই হইবে সে-বিষয়ে তাহারা নিঃসন্দেহ ছিল। এই হেতু ভাগিনের বিষয় পাইত, পুত্র পাইত না। বিষয় যে-ই পাউক, উত্তরাধিকার স্থির করিত পুরুষেরা, নারীর তাহাতে কিছুমাত্র হাত ছিল না। মানুষের বুদ্ধির তারতম্য-হিসাবে ছাগলের গলা ডান দিক ঘেঁসিয়াই কাটা হৌক, কিংবা বাঁ দিক ঘেঁসিয়াই হৌক, ছাগলের ভাল-মন্দ তাহাতে নির্দিষ্ট হয় না। বোধ করি এই কারণেই টাইলার সাহেব স্বর্ণ উপকূলের নিগ্রোদের সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন যে, বাহির হইতে নারীর অবস্থা 'officially superior' দেখাইলেও 'practically very inferior.' আমার মনে হয়, সব জাতির মধ্যেই এই ইঙ্গিত খাটে। Crawley সাহেব সম্প্রতি তাঁহার Mystic Rose গ্রন্থে নারীর উন্নত অবস্থা সম্বন্ধে পাপুয়ানদের কথা তুলিয়া এই যে একটা তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন যে, ইহাদের নারী নির্যাতন করা সম্বন্ধে যথেষ্ট দুর্নাম থাকিলেও, এই যে একটা প্রথা আছে, নারীরাই স্বামী মনোনীত করে এবং বিবাহের প্রস্তাব তাহারাই করিতে পারে, পুরুষে পারে না,—এই প্রথাটাই তাহাদিগের অবস্থা যথেষ্ট উন্নত করিয়া রাখিয়াছে। কথাটা বাহির হইতে মন্দ না শুনাইলেও বিপক্ষে বলিবারও বিস্তর আছে। প্রথম এই যে, মনোনীত করে বলিয়াই যে পুরুষের কাছে নিপীড়িত হয় না, তাহার কোন সঙ্গত হেতু নাই। যাহাদের মধ্যে দাম্পত্য প্রণয়ের কিছুমাত্র ধারণা নাই, যাহারা কথায় কথায় স্ত্রী-হত্যা করে, তাহাদের মধ্যে নারীর এই একটুখানি ক্ষমতা পরিশেষে তাহাদিগের যে বিশেষ কোন কাজে আসে বলিয়া মনে হয় না। রেভারেণ্ড স্টুটার সাহেব বলেন, নারীর অনেকটা মান-মর্যাদা আফ্রিকার কঙ্গো

এবং উগাণ্ডা প্রদেশে আছে। বস্তুতঃ সে-দেশে রমণী রাণী পর্যন্ত হয়। অথচ Captain Speke তাঁহার Discovery of the Source of the Nille গ্রন্থে, কঙ্গো ও উগাণ্ডা দেশের ওয়াহুমা বড় লোকেরা কি করিয়া কথায় কথায় প্রায় বিনা-অপরাধে স্ত্রী-হত্যা করে, নিজের হাতে আঁকিয়া তাহার ছবি পর্যন্ত দিয়া গিয়াছেন; ঐ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, হাতে দড়ি বাঁধিয়া স্ত্রীগুলিকে বধ্যভূমিতে টানিয়া লইয়া যাইবার সময় তাহারা যেভাবে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে যায়, শুনিলে অতিবড় পিশাচেরও দয়া হয়, অথচ সে-দেশের পুরুষগুলি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে না। গ্রন্থকারের তাঁবুর পার্শ্বের পথের উপর দিয়া তাই প্রায়ই বামা-কণ্ঠে কান্না উঠিত—"হে মিয়াঙ্গি, হে বাক্কা!" "ও আমার স্বামী! ও আমার রাজা!" স্বামী এবং রাজাটি বোধ করি তখন মৃদু-মধুর হাস্য করিতেন। সেই দেশের রাজা কিনেরার মৃত্যুর অব্যবহিত পরের ঘটনাগুলি যাহা কাপ্তেন স্পিক তাঁহার পুস্তকে চোখে দেখিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, শিশুরা মাটির পুতুলের যে মূল্য দেয়, সে মূল্যও তথাকার পুরুষেরা নারীকে দেয় না। একস্থানে লেখা আছে, মৃত পিতার সমস্ত কন্যাগুলিকেই ছোট রাজা বিবাহ করিলেন, এবং সাত দিন পরে তাহার তিনটিকে ঠিকমত ঙাজিগ (সেলাম) না করার অপরাধে জীবন্ত দগ্ধ করিলেন। প্রায় পর্যটকই পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে একটা ভালবাসার ব্যাপার অধিকাংশ অসভ্য জাতিরাই অবগত নহে। মন্টেরো বলেন, "The Negro knows not love, affection or jealousy, they have no words or expression in their language indicative of affection or love." সার জন লবক্ ঐ দেশেরই সম্বন্ধে বলেন, "are so cold and indifferent to one another that you would think there was no such thing as love between them." কাফ্রিদের সম্বন্ধে "no feeling of love in marriage." জারিবদের সম্বন্ধে "affection between man and wife out of the question." অথচ

ইহাদিগের মধ্যেও নারীর পতিপ্রেম, স্বামী-সেবার কথা শোনা যায় না, তাহা নহে। হইতে পারে, জবরদস্তির চোটে, সে যাহাই হৌক, অতিশয় নিষ্ঠুর ডাহোমান, মালগাসি, ফিজিয়ান, ছিপা, বেচয়ানা—ইহাদের সকলের ঘরেই পতিব্রতা স্ত্রী পাওয়া যায়। ডাহোমি ও ফিজি দ্বীপে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবারা আত্মহত্যা করে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। আমেরিকার মণ্ডান জাতির বিধবারা মৃত স্বামীর কপাল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া গলায় মালা করিয়া গাঁথিয়া রাখে, রাত্রে মুণ্ডটাকে বিছানায় লইয়া শয়ন করে, স্নান করাইয়া দেয়, আহার করায়, শীতের দিনে কাঁথা দিয়া রাখে, এমন কি গান গাহিয়াও তাহাকে ঘুম পাড়ায়। অথচ পুরুষেরা জীবিতাবস্থায় কি কীর্তিই না করিয়া যান। তবে এমন কথাও বলিতেছি না যে, সর্বত্রই পুরুষেরা ক্রমাগত অত্যাচার করিয়াই চলে, এবং তৎপরিবর্তে রমণীরা কেবল ভালবাসিতে, সেবা করিতেই থাকে। এমন কথা বলিলে মানবের স্বভাবের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়। তবে কোন কোন স্থানে দারুণ অত্যাচার অবিচারের পরিবর্তেও যদি স্নেহ-প্রেম সম্ভবপর হয়, তাহা রমণীতেই হয়, এবং সে দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করিলে নির্মম অসভ্য মানব-সমাজেও যে দুর্লভ নয়, তাহাই গোটা-দুই দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইলাম মাত্র। নারীর এই মূল্য পুরুষ স্বীকার করিতে চাহে না এবং করে না, তাহা বহুবিধ প্রকারেই বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। অবশ্য ইহার প্রতিকূলেও কিছু বলিবার আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ-কথা সত্য যে, তাহা অস্বীকার করিয়া লইলেও এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য তিলার্ধও বিচলিত হয় না।

সে যাহাই হৌক, আমি এতক্ষণ যাহা বলিয়া আসিয়াছি তাহা এই যে, প্রায় কোন দেশেই পুরুষ নারীর যথার্থ মূল্য দেয় নাই এবং তাহাকে নির্যাতন করিয়াই আসিতেছে। নির্যাতন করিয়া যে আসিতেছে সে-কথা অস্বীকার করিবার পথ নাই, কিন্তু ন্যায্য মূল্য হইতে যে চিরদিন বঞ্চিত করিয়াই আসিতেছে, এই কথাটার উপরেই তর্ক বাধিতে পারে। কারণ, কি তাহার সত্য মূল্য তাহা স্থির না করার

পূর্বে বলা চলে না, নারী যথার্থ মূল্য পাইয়াছে কি না। পুরুষ এমন কথাও বলিতে পারে যে, যে-দেশে নারী যে মূল্য লাভ করিয়া আসিতেছে, হয়ত সেই দেশে সেই তাহার প্রাপ্য মূল্য। অতএব, এই কথাটা আলোচনা করা অনাবশ্যক। করিতে হইলে সর্বাগ্রে নর-নারীর সম্বন্ধের বিচারই করিতে হয়। সম্বন্ধ মুখ্যতঃ চারিটা। স্ত্রী, ভগিনী, কন্যা ও জননী—তাহাই আমি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করিতেছি। আদিম মানব কি করিয়া স্ত্রী লাভ করিত, তাহার অনেক তথ্য Joan F. 'MLennan তাঁহার প্রসিদ্ধ Primitive Marriage গ্রন্থে নানা দেশ হইতে আহরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মানুষ যখন পশুর মত ছিল, তখন কি করিয়া স্ত্রী লাভ করিত, আমি এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই সে ইঙ্গিত একাধিকবার করিয়াছি। সবল দুর্বলের নিকট হইতে কাড়িয়া লইত এবং সখ মিটিলে ত্যাগ করিত। তাহার সখের কাছে, তাহার স্ত্রী-লাভের প্রয়োজনের কাছে সে কিছুই বিচার করিত না, কোন সম্বন্ধই তাহাকে বাধা দিতে পারিত না। M'Lennan একস্থানে বলিয়াছেন, "men must originallv have been free of any prejudice against marriage between relations." তাঁহার এ-কথাটা বড় সত্য কথা। Primitive instinct বলিয়া তখন কোন বস্তু ছিল না। মা মেয়ে ভগিনী কিছুই না মানিবার অনেক উদাহরণ শুধু যে অসভ্য আদিম মানবের কাছেই পাওয়া যায় তাহা নহে, অর্ধ-সভ্য ও সুসভ্যের মধ্যেও পাওয়া যায়। অতিশয় সভ্য সমাজেও যে মাঝে মাঝে বীভৎস গোপন কলঙ্কের কথা শোনা যায়, এ-ও যে সেই আদিম মানবের খেলা তাহা heredity-সম্বন্ধে যে-কেহ কিছু আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন। পূর্বে বলিয়াছি, অসভ্য ছিপিওয়েনেরা জননীকে বিবাহ করে। অর্ধ-সভ্য আফ্রিকার গেবুন (Gaboon) প্রদেশের রাণী কিছুদিন পূর্বে স্বামীর মৃত্যুর পর রাজ্য হারাইবার আশঙ্কায় নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিবাহ করিয়া সিংহাসনের দাবী বজায় রাখিয়াছিলেন। পারস্যের সম্রাট্ আর্টজারাক্সস্ নিজের

রূপবতী দুই কন্যারই পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুসভ্য প্রাচীন মিশরের ফারাওরা সহোদরাকে বিবাহ করিতেন। সভ্য পেরু প্রদেশের রোক্কা ইঙ্কার বংশধর ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম ইঙ্কা আভিজাত্য বজায় রাখিবার জন্য দ্বিতীয় পুত্রের সহিত কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিয়া সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। বশিষ্ঠ ঋষিও তাঁহার ভগিনী অরুন্ধতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। লঙ্কা দ্বীপের অসভ্য ভেদ্দারা ছোট বোনকে বিবাহ করা সবচেয়ে গৌরবের ব্যাপার বলিয়া মনে করে; সমাজে কুলীন বলিয়া তখন তাহার মান বাড়ে। বৈমাত্র ভগিনী ও বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করা ত প্রায় সব দেশেই প্রচলিত আছে। অথচ ইহাদের কেহই, এক অসভ্য ভেদ্দা ছাড়া, একটিমাত্র স্ত্রী লইয়া সন্তুষ্ট থাকে না। সকলেই বহু বিবাহ করে। অর্থাৎ, মানুষ ঘরেরটাও পরকে দেয় না, এবং পরেরটাও কাড়িয়া আনে। এখানে যদি মনে করা যায়, উপরে যে-সব কথা বলা হইল, তাহা শুধু ওই-সব দেশ ও জাতির সম্বন্ধে খাটে, অন্যান্য দেশে খাটে না, তাহা হইলে ভুল বুঝা হইবে। সব দেশে এবং সব জাতির সম্বন্ধেই ওই কথা খাটে—কোথাও ও-প্রথা লুপ্ত হইয়াছে, কোথাও আজিও প্রচলিত আছে। আমাদের এ-দেশে আজ বড় ভাই ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু এই দেশের পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই এক দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং ঠিক স্মরণ হইতেছে না, দীর্ঘতমা ঋষিরাও সাত ভাই বুঝি এক স্ত্রী লইয়াই ঋষি-যাত্রা নির্বাহ করিয়াছিলেন, এবং ইহাকেই মহাভারতের আদি পর্বে সনাতন প্রথা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এবং যাহাকে অসভ্যদিগের 'marriage by capture' বলা হয়, তাহার যে বহুল প্রচলন এই সভ্য ভারতভূমেও ছিল, সে দৃষ্টান্তেরও অসদ্ভাব নাই। নারী লইয়া এই যে ঘরে-বাহিরে টানাটানি, কাড়াকাড়ি, অথচ দুইদিন পরে তাহার কোন দাম নাই—এইটা বুঝাইবার জন্যই নারীর আদিম অবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছি। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আবিসিনিয়ার লোকেরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে, সর্দারকে নিজের

মাথার পরিবর্তে যুবতী কন্যা কিংবা স্ত্রী দান করিত। এই মূল্যবান উপহার আবার সর্দার দু'দিন পরে যাহাকে ইচ্ছা বিলাইয়া দিতেন। Captain Speke এই দেশের রাজার সম্বন্ধে একটা দিনের ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন—"next the whole party (king and queens) took a walk, winding through the trees and picking fruits, enjoying themselves amazingly, by some unlucky chance one of the royal wives, a most charming creature and truly one of the best of the lot, plucked a fruit and offered it to the king, thinking doubtless to please him greatly, but he, like a mad man flew into a towering passion, said it was the first a woman ever had the impudence to offer him anything and ordered the pages to seize, bind and lead her off to execution" তাহার পরে স্পিক লিখিতেছেন,—"It was too much for my English blood to stand and of course I ran imminent risk of losing my own in trying to thwart, the capricious tyrant, but I saved the woman's life." নারী লইয়া পুরুষের এই যে পুতুল-খেলা, এই যে স্বার্থপরতা, পাশব-বৃত্তির এই যে একান্ত উন্মত্ততা, সে শুধু নারীজাতিকেই অপমানিত ও অবনমিত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, পুরুষ যে সমাজকে এবং সমস্ত মাতৃভূমিকেই ঐ সঙ্গে টানিয়া নামাইয়া আনিয়াছে। বিভিন্ন দেশের নজীর দিয়া দেখাইবার স্থান এ প্রবন্ধে নাই, তাই আমি শুধু কাপ্তেন স্পিকের আর একটা কথা বলিয়াই থামিব। তিনি বলিয়াছেন, আফ্রিকার এতবড় দুর্দশার বারো আনা হেতু পুরুষের এই উচ্ছৃঙ্খলতা। তথায় সর্দারদিগের এবং ক্ষমতাপন্ন লোকদিগের মৃত্যুর পরেই একটা যুদ্ধ-বিগ্রহ ওলোট-পালট অনিবার্য। সেখানে কে যে কার বৈমাত্র ভাই হয়, কাহার সম্পত্তিতে কাহার যে অধিকার নাই, তাহা গায়ের জোর এবং বল্লমের ফলা ভিন্ন প্রতিপন্ন করার দ্বিতীয় পথ নাই। আরো একটা কথা। ঐ কাপ্তেন সাহেব যখন তাঁহার একজন

ওয়াবিম্বি নিগ্রো ভৃত্যের মুখে শুনিলেন যে, তাহারা নরমাংস আহার করে এবং বড় ভালবাসে, তখন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "বাপু, নরমাংস এত পাও কোথায়? নিজেদের লোক মারিয়া আহার কর কি?" সে লোকটা জবাব দিয়াছিল, "না, নিজেদের লোক মারি না, আশ-পাশের গাঁ হইতে কিনিয়া আনি।" "অর্থাৎ?" লোকটা বলিল, "যে-সব ছেলে-মেয়েদের বাপ নাই, তাহারা খাইতে না পাইয়া প্রায়ই পীড়িত হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের জননীরা একটা ছাগল পাইলেই শিশুগুলিকে দিয়া দেয়, আমরা ঘরে আনিয়া মারিয়া খাই।" সুসভ্য দেশেও বাপ আর একটা বিবাহ করিয়া তাহার দ্বিতীয় পক্ষের শিশুগুলির তুলনায় প্রথম পক্ষের সন্তানগুলির উপরে যেমন অনেক সময়েই নির্দয় হইয়া উঠেন, এ-ক্ষেত্রে জননীরাও বোধ করি সেইরূপই হয়, তবে অসভ্য বলিয়া কিছু বাড়াবাড়ি করে এবং করাই বোধ করি স্বাভাবিক। আন্দামান দ্বীপের অসভ্যদিগের একটা প্রথা আছে, শিশুর দাঁত না ওঠা পর্যন্ত স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে থাকে, তার পর যে যাহার পথ দেখে। পুরুষটি আর একটি স্ত্রী খোঁজে, তাহার স্ত্রীটিও তাই। সে-সময়ে জননীরা প্রায়ই তাহাদের দাঁত-ওঠা শিশুটিকে কোন একটা জলাশয়ের ধারে ফেলিয়া দিয়া দ্বিতীয় সংসার করিতে যায়। সেইজন্যই ডাক্তার Francis Day রিপোর্ট দিয়াছিলেন, আন্দামান দ্বীপবাসীরা "are fast dying out" এবং অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তিনি এমন একটি জননী খুঁজিয়া পান নাই যাহার একসঙ্গে তিনটি সন্তানও জীবিত আছে। আমেরিকার কুচিল জননীরা সন্তান পীড়িত হইয়া পড়িলেই বনের ভিতর ফেলিয়া দিয়া আসে। হারবার্ট স্পেন্সর Savage life and scenes in Australia and New Zealand (by G. F. Angas)-এর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, Angas সাহেবের কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না যে, সত্যই অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্যেরা অভাবে নিজেদের জীবন্ত ছেলে-মেয়েদের বঁড়শিতে গাঁথিয়া কুমীর-হাঙ্গর ধরিবার টোপ (bate) প্রস্তুত করে এবং চর্বি লইয়া মাছ

ধরে ; কিন্তু তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিবার বিশেষ হেতু নাই। কারণ, অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে কোন দেশে যে কোন জাতির মধ্যে সমাজে নারীর স্থান নীচে নামিয়া আসিবার সঙ্গেই শিশুর স্থান আপনি নামিয়া আসে। এ শুধু মানবের নিম্নস্তরের কথা নহে। অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরেও চোখ ফিরাইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নারী যেখানে উপেক্ষার পদার্থ, জাতির মেরুদণ্ড-স্বরূপ শিশুরাও সেখানে উপেক্ষা অবহেলার জিনিস। এ-কথার সত্যতা উদাহরণ দিয়া প্রমাণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা-মাত্র। সে-জাতির ভবিষ্যৎ উত্তরোত্তর অন্ধকার হইয়াই আসিতে থাকে। কিন্তু নর-নারীর শিথিল বন্ধনই তাহার একমাত্র হেতু বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা ভুল করেন। নারী উপেক্ষিত ক্রীড়ার সামগ্রী,— এইটিই সর্বপ্রধান হেতু, হার্‌বার্ট স্পেন্সের তাঁহার Sociology গ্রন্থে আদিম মানবের strong emotion-এর দোহাই পাড়িয়া কি করিয়া এই বিষয়টার মীমাংসা করিতে চাহিয়াছেন ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। রাগের মাথায় "will slay a child for letting fall something it was carrying" ইমোশন হইতে পারে, কিন্তু "kill their children without remorse on various occasions"—মাছ ধরিবার টোপের জন্য ছেলে মারিয়া ধীরে ধীরে তাহার চর্বি বাহির করা, কিংবা desert sick children কি করিয়া ঠিক 'ইমোশন' হইতে পারে বলিতে পারি না। আর তাহাও যদি হয়, তাহাতেও আমার কথাটা অস্বীকৃত হয় না। আদিম মানবের যত-কিছু দোষ থাকিবার তাহা ত আছেই, নর-নারীর বন্ধন প্রায় সর্বত্রই শিথিল,—সে-কথা ত বটেই, কিন্তু তাহাতেও তাহার সামাজিক অবস্থা উত্তরোত্তর নামিয়া আসে না, দিন দিন সে সংসার হইতে অপসৃত হইয়া যায় না, যদি না সে তাহার নারীর অবস্থা নামাইয়া আনে। টাহিটির কথা দৃষ্টান্তের মত উল্লেখ করিতেছি। কাপ্তেন কুক তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইহাদের দাম্পত্য বন্ধন অতি কদর্য—very low, very degraded

এমন কি, যে স্ত্রী সুন্দরী তাহার কিছুতেই একটা স্বামীতে মন ওঠে না ; বাপের বাড়ীর অবস্থা শ্বশুর-বাড়ীর অবস্থা হইতে ভাল হইলে, স্ত্রী "as a right demand and obtain more husbands"—এবং পরবর্তী পর্যটকেরাও এ-সব কথা সত্য বলিয়াই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ-সমস্ত থাকা সত্ত্বেও ঐ দেশের পুরুষেরা নারীকে শ্রদ্ধা-সম্মানের চোখে দেখে। বোধ করি এই জন্যই এ-দেশের শিশু-সন্তানেরা অত্যন্ত যত্নের সহিত প্রতিপালিত হয়, এবং সেদিনেও সকলে এ-কথাটা একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন যে, ইহাদের মত শান্ত,সুশীল, অতিথি-বৎসল এবং সৎ অনেক সভ্য সমাজেও দেখা যায় না। চুরি-ডাকাতি ইহারা জানিত না। সামাজিক অবস্থা তাহাদের অনুকরণীয় এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু তাহারা কোনদিন নারীর অসম্মান করে নাই। অন্যান্য অসভ্যের মত রমণীর স্থান টানিয়া নীচে নামাইয়া আনে নাই বলিয়াই, ১৯০৬ সালে C. L. Wragge, The Romance of the South Seas গ্রন্থে টাহিটি দ্বীপের অধিবাসীদের সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠে লিখিয়া গিয়াছেন—"And what are *the duties* of women ? To look after the house and mind the children ; to be good wives, good mothers, to leave politics alone and darn the clothes. Tahitian women, in women's sphere, are superior by far, in my opinion, to their sisters in the Bois, and few Belgraviennes can give them points."

সিলোনের অতি অসভ্য ভেদ্দারা, যাহারা নারী-জাতিকে অতিশয় শ্রদ্ধা-সম্মান করে, প্রাণান্তেও এক স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে না এবং কিছুতেই স্ত্রী ত্যাগ করে না, তাহাদের সম্বন্ধে জার্মান বিজ্ঞানাচার্য হেকেল বলিয়া গিয়াছেন, সততা ও ন্যায়পরায়ণতায় ইহারা ইউরোপের অনেক সভ্য জাতিকেই শিক্ষা দিতে পারে। ইহাদের অপত্য-স্নেহের মত মধুর বস্তু জগতে দুর্লভ। ডায়েক ও টোডাদে

সম্বন্ধে প্রায় এই কথা খাটে। তিব্বতের রমণীদের চরিত্র-বিষয়ে খুব সুনাম নাই। শুধু যে তাহারা সব কয়টি ভাইকেই স্বামিত্বে বরণ করে তাহা নহে, করুণা হইলে পাড়া-প্রতিবেশীর আবেদন-নিবেদনও অগ্রাহ্য করে না। তথাপি দেশের পুরুষেরা তাহাদের নারীকে অত্যন্ত সম্মান করে। বোধ করি এই জন্যই রাজা রামমোহন রায় এই তিব্বতী রমণীদের সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন, "বিপদের দিনে এই তিব্বতের রমণীর দয়াতেই প্রাণ যায় নাই এবং আজিও চল্লিশ বৎসর পরে সেই রমণীগণের কথা স্মরণ করিলে চক্ষু অশ্রু-পূর্ণ হয়"—এবং ইহাদের কাছেই তিনি সারাজীবন ধরিয়া নারীজাতিকে শ্রদ্ধা এবং সম্মান করিতে শিখিয়াছিলেন, এ-কথা তিনি নিজের মুখেই স্বীকার করিয়া গিয়েছেন।

এইখানে আবার পাঠকের কাছে একটা অতি বিনীত নিবেদন আছে। এই-সব দৃষ্টান্ত হইতে আমাকে যেন এমন ভুল না বোঝা হয় যে,—আমি অসচ্চরিত্রার গুণ গাহিতেছি। আমি গুণ গাহিতেছি না,—শুধু কথাটা বুঝাইয়া বলিতে চাহিতেছি যে, এমন অবস্থাতেও পুরুষ নারীকে সম্মান দিয়া, তাহার একটা মূল্য দিয়াও ঠকে নাই। তাহার একটা স্বাভাবিক সত্য মূল্য আছে বলিয়াই, এমন অবস্থাতেও পুরুষ জিতিয়াছে বই হারে নাই। এইবার একটা বিপরীত দৃষ্টান্ত লইয়া দেখি। ফিজি দ্বীপের রমণী। এমন পতিব্রতা স্ত্রী আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। স্বামীর গোরের উপর ইহারা স্বেচ্ছায় উদ্বন্ধনে প্রাণ দেয়, তাহা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু পুরুষেরা শুধুই বহু-বিবাহ করে না, কথায় কথায় স্ত্রী-হত্যা করে,—নারীর স্থান এখানে গৃহপালিত পশুর সমান, বরং নীচে। জননীরা প্রার্থনা করে তাহার সন্তান যেন প্রসিদ্ধ চোর-ডাকাত এবং খুনে হয়। পুত্ররাও অনেক সময়ে জননীর প্রাণ বধ করিয়া হাতে-খড়ি দেয়। বাপ শুনিয়া হাসে, বলে, ছেলে আমার বীরপুরুষ হইবে। কিন্তু রমণীগুলির নিষ্ঠুর অন্তঃকরণের উল্লেখ করিয়া অনেক পর্যটকই বলিয়া গিয়াছেন, পুরুষেরা লড়াই করিয়া কাহাকেও বন্দী করিয়া আনিল, তাহাকে আহার করিবার পূর্বে মেয়েদের আমোদের

জন্য অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দেয়। তাহার হাত-পা বাঁধা,—স্ত্রীলোকদিগের সবচেয়ে বড় আমোদ খোঁচা দিয়া তাহার চোখ তুলিয়া ফেলা। স্ত্রীলোকেরা সেই হতভাগাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া কেহ বা চোখ তুলিতে থাকে, কেহ ছুরি দিয়া পেট কাটিয়া নাড়ী বাহির করিতে থাকে, কেহ পাথর দিয়া দাঁত ভাঙ্গিতে থাকে; সে যত চেঁচায়, ইহারা ততই আমোদ পায়। এই সেই দেশের নারী, অথচ অসভ্য কেন, সুসভ্যের মধ্যেও তাহাদের মত পতিভক্তি ও সতীত্ব পাওয়া কঠিন। তবে, কেমন করিয়া এমন সম্ভব হইল? সতীত্বে যাহাদের প্রায় সমকক্ষ নাই, কি দোষে, কাহার পাপে সেই নারী-হৃদয় এমন পাথরের মত হইয়া গেল?

নারী-সম্বন্ধে পুরুষের সহৃদয়তা ও ন্যায়পরতার পরিচয় দিতে গিয়া অনেক নজীর এবং অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি, আর বলিতে চাহি না। কারণ, ইহাতেও যদি যথেষ্ট না হইয়া থাকে ত আর হইয়াও কাজ নাই। অতঃপর আর দুই-একটা স্থূল কথা বলিয়াই এ প্রবন্ধ শেষ করিব। আগে নর-নারীর নানাবিধ সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়া প্রথমেই দাম্পত্য সম্বন্ধের আলোচনা করিয়াছি। তাহার হেতু শুধু ইহাই নহে যে, যেখানে অন্যান্য সম্বন্ধ অস্পষ্ট, সেখানেও ইহা স্পষ্টতর, অপিচ জীবমাত্রেই সমস্ত সম্বন্ধ হইতে ইহার আকর্ষণও তেমন দৃঢ়তর, স্পৃহা ও মোহও তেমনি দীর্ঘ-কালব্যাপী।

আমাদের দেশের বিজ্ঞজনেরাও বলিয়াছেন, ছয়টা রসের মধ্যে মধুর রসটাই শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠ রসের উৎপত্তি মানবের যৌন বন্ধন হইতে। বস্তুতঃ, সামাজিক মানব যত প্রকারের সম্বন্ধে রস-ভোগ করিতে শিখিয়াছে, সর্বশ্রেষ্ঠ এই মধুর রসের মধ্যেই যাবতীয় রসের সমাবেশ ও বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এইজন্যই একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই চোখে পড়ে, যে-কোন দেশে এই রসের ধারণা যত ক্ষীণ, বন্ধন যত ক্ষণস্থায়ী ও ভগ্নপ্রবণ, নর-নারীর অপরাপর সম্বন্ধেও সেখানে সেই অনুপাতে হীন। জগতের যে কোন দেশ

বা জাতির সম্বন্ধে স্ত্রী অপেক্ষা জননী বা ভগিনী প্রিয়তর, এমন কথাটা বলিতে পারিলে হয়ত ভালই শোনায়, কিন্তু সেটা মিথ্যা বলা হয়। তবে এইখানে একটা বিষয়ে পাঠককে সতর্ক করাও আবশ্যক। যেহেতু, এমন কয়েকটা দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে তলাইয়া না দেখিলেই উল্টা ব্যাপার ঘটিতেছে বলিয়া ভ্রম হয়। কয়েকটা অসভ্য বা অর্ধ-সভ্য জাতির মধ্যে একদিকে নারীর যেমন দুর্দশার সীমা-পরিসীমা নাই, অন্যদিকে তেমনি ইহাকেই বাটীর এমন কি সমাজের কর্ত্রী হইতেও দেখা যায়। অসভ্য ফিউজিয়ানদের মধ্যে "oldest women exercise great authority." মেক্সিকোর আদিম জাতির মধ্যেও তাই, হায়দাদিগের মধ্যেও তাই। চীনাদের মধ্যে বৃদ্ধা পিতামহী বাটীর কর্ত্রী। সুমাত্রা, মাডাগাস্কার, এমন কি কঙ্গোতেও রমণীকে রাণী হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি? একটুখানি ভিতরে প্রবেশ করিলেই সংশয় জাগিয়া উঠে, যে-দেশে রমণী ভারবাহী জীব, বিবাহের সময় যাহার মূল্য গরু-বাছুরের তুলনায় নিরূপিত হয়, সন্তান-প্রসবে অক্ষম হইলে যাহাকে পুনরায় বাজারে বিক্রয় করিয়া ফেলা হয়, slave বলিতে যেখানে শুধু নারীই বুঝায়, সেই নারীর কর্তৃত্ব কেমন করিয়া একটা বাস্তব ব্যাপার হইতে পারে? ঠিক এই কথাটার উপরেই Boncroft একস্থানে বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকের কর্তৃত্ব বোধ করি নাম-মাত্র। আমি নিজেদের ঘরের কথা ভাবিতেছিলাম। এদেশেও কর্তার অবর্তমানে বৃদ্ধা জননী বা পিতামহীকে কর্ত্রী বলিয়া স্বীকার করে। কিন্তু তার পরে? মনের অগোচরে পাপ নাই,—কথাটা ঘাঁটাঘাটি করিতে চাহি না। এ-দেশেই সম্পত্তির লোভে গুরুজনকে বাঁধিয়া পোড়ানো হইত। অথচ, পুরুষের নানাবিধ জবাবদিহির মধ্যে একটা চমৎকার জবাবদিহি স্পেন্সর সাহেবের পুস্তকে লেখা আছে—"It was adopted as a remedy for the practice of poisoning their husbands, which had become common among Hindoo women." খবরটি

কোন্ পণ্ডিত তাঁহাকে দিয়াছিল জানি না, কিন্তু পোড়ানোর ধরণ-ধারণ দেখিয়া সে-বেচারা বিদেশীর চোখে বোধ করি নারীর এমনি একটা কিছু গুরুতর অপরাধের কথাই সম্ভবপর বলিয়া ঠেকিয়াছিল। হায় রে, পুড়িয়া মরিয়াও নিষ্কৃতি নাই! যাহাই হৌক, কথাটা মিথ্যা,—সে নিজেই বানাইয়াছিল। কারণ, এ-দেশের টুলো পণ্ডিতদের তরফ হইতে পোড়াইয়া মারার সপক্ষে বিলাতে যে আপীল রুজু করা হইয়াছিল, তাহাতে বিধবার বিরুদ্ধে এ অভিযোগের উল্লেখ নাই। যাক এ-কথা।

কথা হইতেছিল, ঐ কয়েকটি স্থানে অবস্থাবিশেষে নারীর কর্তৃত্বের বস্তুগত্যা অস্তিত্ব আছে কি না। থাকিলেও কিভাবে থাকা অধিক সম্ভবপর? কিন্তু নর-নারীর যাবতীয় সম্বন্ধের ন্যায়সঙ্গত দাবী নারীর যাহাই হৌক, পুরুষ স্থান, কাল ও অবস্থাভেদে যে-মূল্য তাহাকে দিয়া আসিতেছে, সেই তাহার প্রাপ্য মূল্য কি না? কারণ, পুরুষ এই বলিয়া একটা বড় রকমের উত্তর করিতে পারে যে, অবস্থাভেদে সে যে-মূল্য রমণীকে দিয়া আসিয়াছে তাহা ঠিকই হইয়াছে। যেমন, এদেশের কোন এক পণ্ডিত তাঁহার বইয়ে লিখিয়াছেন যে, মনুর সময়ে ব্যভিচার-স্রোত অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়াই অমন হাড়-ভাঙ্গা আইন-কানুন নারীর উপর জারি করা হইয়াছিল। বোধ করি ইঁহার ধারণা যে, ব্যভিচারের জন্য শুধু নারীই দায়ী, পুরুষের তাহাতে নামগন্ধও ছিল না। সে যাহাই হৌক, এই উত্তরটারও কোন বনিয়াদ আছে কি না, তাহার মীমাংসা করা আবশ্যক। ইতিপূর্বে এই প্রবন্ধের একস্থানে বলিয়াছি, সংসারে নারী যদি বিরল হইতেন, তবেই নারীর যথার্থ মূল্য স্থির করা সহজ হইত, কিন্তু 'যদি' কথা ছাড়িয়া দিয়া ইহার বর্তমান অবস্থার ঠিক দামটি পুরুষ দিয়াছে কি না, তাহাই দেখিবার চেষ্টা করিতেছি।

অ্যাডাম স্মিথ যখন প্রথম প্রচার করেন, জগতের সমস্ত বস্তুই যেমন নৈসর্গিক নিয়মের অধীন, তাহাদের মূল্যও সেই নিয়মেরই অধীন, তখন সকল লোকে বুঝিতে পারে নাই। তাহারা মনে করিয়াছিল,

তাহাদের জিনিস তাহারা যদৃচ্ছ বেচিবে-কিনিবে—সে-মূল্য ধার্য করিয়া দিবার মালিক তাহারা ছাড়া আর কেহ নাই। এই অহঙ্কারে মানুষ প্রায় শতাব্দীকাল পর্যন্ত এই সত্যকে অস্বীকার করিয়াই চলিয়াছিল। এখনই যে সকলে একবাক্যে মানিয়া লইয়াছে তাহা বলি না, কিন্তু যাহারা মানিয়াছে তাহারা এটা বেশ দেখিতে পাইয়াছে, এই অস্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলিলে শেষ পর্যন্ত কিছুতেই সুফল ফলে না—তাহাদেরও না, আর পাঁচ জনেরও না, ধান-চালের বাজারেও না, ছেলে-মেয়ে বেচাবেচির বাজারেও না। এই অন্ধভার একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, গায়ের জোরে দাম বাড়ানোর একটা জীবন্ত সাক্ষী আমাদের দেশের কৌলীন্য বংশগত করাটা। তা যদি না হইত, তাহা হইলে আজ কুলীন বামুন বলিলে লোকে গালাগালি মনে করিত না। বামুনের ছেলে শ্বশুর-বাড়ী গিয়া পয়সা লইয়া রাত্রিযাপন করে, এবং পরদিন সেই পয়সায় গাঁজা-গুলি খায়, এটা হইতে পারিত না। মানুষ, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ-সন্তান, কতটা হীন হইবার পরে তবে যে এই কাজ করিতে সমর্থ হয়, তাহা বুঝাইয়া বলিতে যাওয়াই বাড়াবাড়ি। এই কুলীনের ছেলে কুলীনকে ভ্রান্ত সমাজ যে মূল্য দিতেছিল, সে তাহার যথার্থ প্রাপ্য মূল্য হইলে, কিছুতেই তাহারও এতবড় অবনতি ঘটিত না, সমাজও এমন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অগণিত নিরুপায় বঙ্গ-রমণীর নিষ্পাপ রক্ত সর্বাঙ্গে মাখিয়া, তাহাদের ব্যর্থ জীবনের দীর্ঘশ্বাস ও অভিসম্পাত বহিয়া, ভগবানের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া, এমন পঙ্গু এমন মিথ্যা হইয়া পড়িতে পারিত না। আজ বোধ করি কতকটা চক্ষু খুলিয়াছে। যাহার সত্য মূল্য নাই, রাজাজ্ঞাতেই হৌক, বা সমাজের ইচ্ছাতেই হৌক, তাহার মূল্য অযথা বাড়াইয়া তুলিলে পরিণামে মঙ্গল হয় না। এই সত্য অপরদিকেও ঠিক এমনি প্রযুজ্য। যাহার যতটা মূল্য তাহাকে ঠিক ততটা দিতেই হইবে—অজ্ঞানেই হৌক বা অহঙ্কারেই হৌক, বঞ্চিত করিয়া কিছুতেই কল্যাণ লাভ করা যাইবে না। মিথ্যা কখনও জয়ী হইবে না। এই হিসাবে যাচাই করিয়া

যদি দেখা যায়, পুরুষ নারীকে যে মূল্য দিয়া আসিয়াছে, তাহাতে উত্তরোত্তর ভালই হইয়াছে, তাহা হইলে নিশ্চয় ইহাই তাহাতে প্রাপ্য মূল্য ; অন্যথা স্বীকার করিতেই হইবে, বঞ্চনা করিয়াছে, পীড়ন করিয়াছে এবং সেইসঙ্গে সমাজে অকল্যাণ টানিয়া আনিয়াছে। প্রথমে একটা অবান্তর কথা বলিব। আমার এই প্রবন্ধের কতকটা পাঠ করিয়াই সেদিন আমার এক আত্মীয় "morbid mind"-এর পরিচয় পাইয়াছেন ; আর এক আত্মীয় নর-নারীর বিসদৃশ সম্বন্ধের আলোচনা করা অপরাধে এমনিই কি-একটা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। পুরুষেরা যে এ-কথা বলিবেন, তাহা জানিতাম ; কিন্তু এ-সকল কথার উত্তর দিতে আমার লজ্জা বোধ হয়।

আগে আদিম ও অসভ্য মানব-জাতির সামাজিক ও সাংসারিক আচার-ব্যবহারের উল্লেখ করিতে গিয়া এমন অনেক কথা বাধ্য হইয়া আমাকে বলিতে হইয়াছে, যাহা পাঠ করিলেও মানুষ শিহরিয়া উঠে। কিন্তু ও-সব উল্লেখের প্রয়োজন শুধু যে পুরুষের দোষ দেখাইবার জন্যই হইয়াছিল, তাহা নহে। সামাজিক মানব-সম্বন্ধে এই যে একটা উক্তি আছে যে, "perhaps in no way is the moral progress of mankind more clearly shown than by contrasting the position of women among savage with their position among the most advanced of the civilized. ইহা সত্য বলিয়া মনে করি বলিয়াই ঐ-সব দৃষ্টান্ত দিবার আবশ্যক হইয়াছিল। বস্তুতঃ, মানবের নৈতিক উন্নতি অবনতি বুঝিয়া লইবার ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায় আছে কি না জানি না বলিয়াই অত কথা বলিয়াছি, তা আমার আত্মীয়-দুটি বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন।

আর একবার মধুর রসের কথাটা পাড়িব। কারণ, এই রস মানুষকে কতভাবে, কত দিক দিয়া যে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে, তাহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। সুতরাং, একবার যাহা বলিয়াছি, পুনরায় তাহার আবৃত্তি করিতেছি,—এই রসবোধ যেখানে যত কম, এদিকে দৃষ্টি যাহার

যত ক্ষীণ, সে ততই অমানুষ। এই রস অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াসেই মানবের অজ্ঞাতসারে সতীত্বের সৃষ্টি, এই রস-মাহাত্ম্য গাহিয়াই মানুষ কবি। এই রসের অবমাননা করিয়াই ভারতের যুগ-বিশেষ, এবং মধ্য-যুগের ইউরোপ নারীকে peculiar representative of sexuality বলিয়া ভুল করিয়া যে অধঃপথে গিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা চলে না। এই রসবোধের প্রধান উপাদান নারীর সৌন্দর্য। পুরুষ যত বর্বরই হৌক, রূপের সম্মান সে না করিয়াই পারে না। এমন কি পটুয়ারা, যাহারা গরুর অভাবে স্ত্রীলোকদিগের কাঁধে লাঙ্গলের জোয়াল তুলিয়া দিয়া জমি চাষ করে, তাহাদের মধ্যেও দেখা যায় যে, যে রমণীগুলি অপেক্ষাকৃত সুন্দরী তাহারা লাঙ্গল কম টানে। আবার সৌন্দর্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে বেশী করিয়া লাঙ্গল টানিতে হয়। রেভঃ জন রস কোরিয়ার ইতিহাসে কোরিয়াবাসীদের সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ ব্যবহার অনেকস্থানেই লিখিয়া গিয়াছেন।

তবেই দেখা যায়, তা যত অল্পই হৌক, রূপের একটু সুবিধা আছেই, এবং এই সুবিধা শুধু তাহার একার নহে, পুরুষেরও হৃদয়-বৃত্তি উচ্চ করিবার পক্ষেও ইহা যথেষ্ট সাহায্য করে। নিজের নিষ্ঠুরতা সে দুটো দিনের জন্যও দমন করিতে শিক্ষা করে। কিন্তু এই শিক্ষা তাহার নিজের দোষেই অধিকদূর অগ্রসর হইতে পায় না। দেখা যায়, সমাজ যাহার যত নীচ, নারীর সৌন্দর্যও সেখানে তত অল্প এবং ততোধিক ক্ষণস্থায়ী। নজীর তুলিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। কিন্তু, প্রায় পর্যটকেই লিখিয়া গিয়াছেন, যাহাদের মধ্যেই নারীর status অত্যন্ত low, তাহাদের মধ্যেই পুরুষেরা বরং দেখিতে ভাল, কিন্তু রমণীরা এতই কুৎসিত কদাকার যে চাহিয়া থাকিতেও ঘৃণা বোধ হয়। কিন্তু ইহাই কি স্বাভাবিক এবং সঙ্গত নয়? নিদারুণ পরিশ্রম, দিনের অধিকাংশ সময় রুদ্ধ দুষ্ট বায়ুতে চলা-ফেরা, অতি অল্প বয়সেই সন্তান প্রসব ও প্রতিপালন করা, পুরুষের ভুক্তাবশিষ্ট কদর্য আহার্য ভক্ষণ করা,—কেমন করিয়া তাহার রূপ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে?

আবার রূপ মানে শুধু রূপ নহে, রূপ মানে স্বাস্থ্য। তাহার রূপ যায়, স্বাস্থ্য যায়, যৌবন দু'দিনেই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে; অতঃপর এই দুর্বল, বিগতযৌবনা রমণীর নিকট হইতে পুরুষ যা-কিছু বলপূর্বক আদায় করিয়া লইতে থাকে; তাহাতে চারিদিকেই অমঙ্গল বাড়িয়া যায়। স্থান ও সময় থাকিলে দেখাইতে পারিতাম, সমাজে নারীর স্থান নামিয়া আসিবার সঙ্গে-সঙ্গেই নর-নারীর উভয়েরই বাঁচিয়া থাকিবার মিয়াদও কেমন করিয়া কমিয়া আসে। এইজন্যই বোধ করি সমস্ত অসভ্য বা অর্ধ-সভ্যেরাই অল্পায়ু। এই প্রসঙ্গে আমরা যদি নিজেদের ঘরের দিকে চোখ ফিরাইয়া দেখি, দেখিতে পাই উহাদের সহিত আমাদের কিছুই মিলে না। উহাদের মত আমাদের রমণীরা অল্পদিনেই স্বাস্থ্য এবং যৌবন হারান না, তাঁহাদের গর্ভের সন্তানও রুগ্ন বা অল্পায়ু হয় না, অল্প বয়সেই বিধবা হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দুঃখীর সংসার আরো ভারাক্রান্ত করেন না, এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের সৎ ও স্বাধীন জীবিকা অর্জনের পথ-ঘাট আমরা বন্ধ করিয়া দিই নাই,— তাহা হইলে নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে, যে-মূল্য আমরা নারীকে দিয়া আসিতেছি তাহাই ঠিক হইয়াছে। অন্যথা বলিতেই হইবে, আমাদের ভুল হইয়াছে এবং ধর্মতঃ সে ভুল অপনোদন করিতে আমরা বাধ্য। শুধু এই কথাটা একটু সাহস করিয়া দেখিলে অনেক সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে যে, যে-সব বিধি-নিষেধের শৃঙ্খল নারী-দেহে পরাইয়া রাখিয়া আমরা নিজেদের সুখ্যাতি নিজেরাই গাহিয়া বেড়াইতেছি, তাহাতে সুফল ফলিতেছে কি না। ভাল-মন্দ দেখিতে পাওয়া শক্ত কাজ নয়, স্বীকার করিতে পারাই শক্ত কাজ। এই শক্ত কাজটাই নির্ভয়ে স্বীকার করিয়া ফেলিতে আমি দেশের পুরুষকে অনুরোধ করি। তাহা হইলেই কি বিধি-নিষেধ থাকিবে, বা থাকিবে না, কোন্‌টা সময়োপযোগী, এবং তখন কিসে বর্তমানকালে কল্যাণ হইবে, তাহা আপনিই স্থির হইয়া যাইবে। তখন মনুর সময়ে ব্যাভিচার-স্রোত প্রবল ছিল, কি ছিল না, এ তর্কের মীমাংসা না হইলেও চলিবে।

মধুর রসের সমস্ত রসটুকু নারীর নিকট হইতে নিঙড়াইয়া বাহির করিয়া লইব, নিজেরা কিছুই দিব না, এটা চালাকি হইতে পারে, কিন্তু এ চালাকি চিরদিন চলে না, বিশ্বেশ্বরের অলঙ্ঘ্য আদালতে একদিন ধরা পড়েই। তখনো রসটা মধুর থাকিতে পারে, কিন্তু ফলটা আর মধুর হয় না।

আরো একটা কথা। সামাজিক নিয়ম-সম্বন্ধে যাহারাই আলোচনা করিয়া তাঁহাদের পরিশ্রমের ফল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এ সত্যটাও আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন যে, সমাজে নারীর স্থান অবনত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের স্থান আপনি নামিয়া আসে। কেন হয় এবং হওয়া স্বাভাবিক কি না, এ-কথা বুঝিতে পারা কঠিন নহে। আমিও ইতিপূর্বে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছি, শিশুর জননীর সহিত যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, পিতার সহিত তত নয়। এই কারণেই সংসারে কৃতী লোকের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহারা সকলেই এমন মা পাইয়াছিলেন যাহাতে সংসারে উন্নতি করা অসম্ভব হইয়া উঠে নাই। কিন্তু এই মায়ের অবস্থাটা সাধারণতঃ যদি দিন দিন নামিয়া পড়িতে থাকে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে দেশের কৃতী সন্তানের সংখ্যা কমিয়া আসিতেই থাকে, এই প্রতিযোগিতার দিনে সে জাতি আর জাতির মত জাতি হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তবে এতকাল টিঁকিয়া রহিল কিরূপে? এই বলিয়া জবাবদিহি করিতে যাঁহারা চান, তাঁহাদের শুধু এইটুকুমাত্রই বলিতে চাই যে, কোনমতে কেবল প্রাণধারণ করিয়া থাকাটাই মানুষের বাঁচা নয়।

সমাজে নারীর স্থান নামিয়া আসিলে, নর-নারী উভয়েরই অনিষ্ট ঘটে, সে-সম্বন্ধে বোধ করি মতভেদ থাকিতে পারে না; এবং এই অনিষ্টের অনুসরণ করিলেই যে নারীর স্থান নির্দিষ্ট হইতে পারে, তাহাও বুঝিতে পারা কঠিন ব্যাপার নয়। সমাজ মানে নর-নারী। শুধু নরও নয়, শুধু নারীও নয়। উভয়েরই কর্তব্য সম্যক্ প্রতিপালিত হইতেছে কি না। কর্তব্য বলিতে শুধু নিজের কাজটাই বুঝায় না, অপরকেও

ঠিক ততটা কাজ করিবার অবকাশ দেওয়া হইতেছে কি না, তাহাও বুঝায়। সেইটুকুই বুঝিতে বলিতেছি।

আরও একটা কথা এই যে, পুরুষের সমস্ত কাজ নারী করিতে পারে না, নারীর সমস্ত কাজও পুরুষে করিতে পারে না ; কিংবা যে কর্তব্য দু'জনে মিলিয়া করিলে তবেই সুসম্পন্ন হয়, তাহাও শুধু একার দ্বারা সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। অতএব, সমস্ত সমাজেরই দেখা উচিত, তথায় নারীর কর্তব্য প্রতিপালিত হইতেছে কি না, এবং কাজ করিবার ন্যায্য স্বাধীনতা ও প্রশস্ত স্থান তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে কি না। জেলের কয়েদীদিগের কাছেও ভাল কাজ আদায় করিয়া লইতে হইলে, তাহাদের শৃঙ্খলের ভার লঘু করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। অবশ্য শৃঙ্খল একেবারে মুক্ত করিয়া দিবার কথা বলিতেছি না—তাহাতে আমেরিকার মেয়েদের দশা ঘটে। তাহাদের অবাধ স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হইয়াছে। একদিন প্রাচীন রোমে আইন পাশ করিতে হইয়াছিল "to prevent great ladies from becoming public prostitutes." কোথায় একবার পড়িয়াছিলাম, তিব্বতে এক স্ত্রীর বহু-স্বামিত্বের প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বোধ করি একটুখানি পরিহাস করিয়াই বলিয়াছেন—এ-সব কথা লিখিতে ভয় হয়, পাছে আমেরিকার নারীরাও খেয়াল ধরিয়া বসে আমরাও ওই চাই। তাহাদের ব্যাপার দেখিয়া প্রায় সমস্ত পুরুষেরই হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকিয়া যাইবার মত হইয়াছে। তাই কতকটা শৃঙ্খলের প্রয়োজন। অপরপক্ষে, শৃঙ্খল একেবারে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলে পুরুষেরাও যে কত অবিচারী, উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে এই ভারতবর্ষেই সে-দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই।

যাহাই হোক, কথা হইতেছিল কাজ করিবার ন্যায্য স্বাধীনতা এবং ন্যায্য স্থান ছাড়িয়া দেওয়া, এবং কোন্ কাজটা কাহার, এবং কোন্ কাজটা উভয়ের এই মীমাংসা করিয়া লওয়া। মানব-সমাজের যত নিম্নস্তরে অবতরণ করা যায়, ততই চোখে পড়িতে থাকে, এই ভুলটাই

তাহারা ক্রমাগত করিয়া আসিয়াছে, এবং তাহাতে কিছুতেই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। অধিকাংশ স্থলেই পুরুষ শুধু লড়াই করে, এবং শিকার করে—আর কিছু করে না। জীবন-ধারণের বাকী কাজগুলা সমস্তই একা নারীকে করিতে হয়। তাহারা জল তোলে, কাঠ কাটে, মোট বয়, জমি চাষ করে, সন্তান প্রসব করে, রাঁধা-বাড়া সমস্তই করে। এমন কি, শিকারলব্ধ পশুটাকেও বহিয়া আনিবার জন্য বনে জঙ্গলে পুরুষের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় এবং ইহার অনিবার্য ফলও যাহা হইবার ঠিক তাহাই হয়। অবশ্য স্বীকার করি, সব দেশেই কিছু নর-নারীর কাজের ধারণা এক হইতে পারে না—হয়ও না। কিন্তু একটু মনোযোগ করিলেই টের পাওয়া যায়, সভ্যতার অনুপাতে কর্তব্য-বিভাগের একটা সাদৃশ্য আছে, এবং এই অনুপাত যত বাড়িতে থাকে, সাদৃশ্যও তত কমিয়া আসিতে থাকে। যেমন, ব্যবহারের নিমিত্ত দূর হইতে জল আনিবার আবশ্যক হইলে, একজন ফরাসী কিংবা ইংরাজ হয়ত তাহা নিজেরাই করিবেন, কিন্তু আমরা লজ্জায় মরিয়া যাইব, এবং তাহার পরিবর্তে গর্ভবতী স্ত্রীর কাঁকালে একটা মস্ত ঘড়া তুলিয়া দিয়া জলাশয়ে পাঠাইয়া দিয়া লজ্জা নিবারণ করিব। পেরুর উন্নত অবস্থার দিনে পুরুষ চরকা কাটিত এবং কাপড় বুনিত, স্ত্রীলোক লাঙ্গল ঠেলিত। এখনো সামোয়ার অধিবাসীরা রাঁধা-বাড়া করে, স্ত্রীলোক হাটে-বাজারে যায়। আবিসিনিয়ার পুরুষদের বাজারে যাইতে মাথা-কাটা যায়, কিন্তু প্রফুল্ল-মুখে ঘাট হইতে নরনারী উভয়েরই কাপড় কাচিয়া আনে। এইরূপ কাজ-কর্মের ধারণা সব দেশে এক নয়, এবং ছোট-খাটো বিষয়ে এক না হইলেও বেশী কিছু আসিয়া যায় না সত্য, কিন্তু এই ধারণা স্বাভাবিক নিয়মকে অতিক্রম করিয়া গেলে অমঙ্গল অনিবার্য। অর্থাৎ, পুরুষ সর্ববিষয়ে স্ত্রীলোকদের কাজ করিতে গেলে, যেমন করডোদের মত অকর্মণ্য হীন হইয়া পড়ে, তেমনি ডাহোমি রাজার স্ত্রী-সৈন্যও যথার্থ unsexed হইয়াই তবে

লড়াই করিতে পারে। তাহাতে নিজেরও কল্যাণ হয় না, দেশেরও না। কিন্তু এইসমস্ত পুরুষোচিত কাজ-কর্মের দরুণই একদল পণ্ডিতের এমত বিশ্বাসও জন্মিয়া গিয়াছে যে, আদিম যুগে নর-নারীর মধ্যে নারীর স্থানই উচ্চে ছিল। তাহারাই leader of civilizarion, অথচ কেন সংসারে নারীর স্থান এমন উত্তরোত্তর নামিয়া পড়িয়াছে, তাহার কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া স্পেন্সর সাহেব স্থির করিয়াছেন, দেশের লোক যত যুদ্ধপ্রিয়, অন্ততঃ আত্মরক্ষার জন্য যাহাদিগকে ঘরে-বাহিরে যত বেশী লড়াই করিতে হইয়াছে, তাহারাই তত বেশী নারীর উপর অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে, তত বেশী গায়ের জোর খাটাইয়াছে। নারীর যে স্বাভাবিক কোমলতা ও নম্রতার জন্যই স্বেচ্ছায় এত নির্যাতন এবং অধীনতা স্বীকার করিয়াছে তাহা নহে। তাহারা গায়ের জোরে পারিয়া উঠে নাই বলিয়াই স্বীকার করিয়াছে, পারিলে স্বীকার করিত না। কারণ, দেখা গিয়াছে যেখানে সুবিধা এবং সুযোগ মিলিয়াছে, সেখানে নারী পুরুষ অপেক্ষা এক তিলও কম নিষ্ঠুর বা কম রক্তপিপাসু নয়। এখানে এইটাই দেখিবার বিষয় যে, পুরুষ যদি এই বলিয়া জবাবদিহি করে সে দুর্বলের উপর গায়ের জোর খাটাইয়া কর্তৃত্ব করে নাই, বুঝিয়া-সুঝিয়া ধীর-স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া, কর্তব্য এবং মঙ্গলের খাতিরেই বাধ্য হইয়া নাবীব এই নিম্ন স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাহা হইলে সে-কথা সত্য নয়।

অবশ্য স্পেন্সরের এই মত সকলেই যে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু যতগুলা বিভিন্ন প্রতিবাদ অন্ততঃ আমার চোখে পড়িয়াছে, তাহাতে স্পেন্সরের মতটাই সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "militancy implies predominance of compulsory co-operation",:এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলের উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন, "Hence the disregard of woman's claims shown in stealing and buying them; hence the inequality

of status between the sexes entailed by polygamy, hence the use of women as labouring slaves ; hence the life-and-death power over wife and child ; and hence the constitution of the family which subjects all its members to the eldest male. Conversely, the type of individual nature developed by voluntary co-operation in societies that are predominantly industrial, whether they be peaceful, simple tribes, or nations that have in great measure outgrown militancy, is relatively altruistic nature"

বাস্তবিক এ compulsory co-operation যেখানে এত 'binding', তা লড়াইয়ের জন্যই হৌক, আর পরকালের জন্যই হৌক, নারীর অবস্থা সেখানে তত হীন। ধর্মের গোঁড়ামি, অধর্মের অত্যাচার নারীকে যে কত নীচু করিয়াছিল ইউরোপের মধ্য-যুগ তাহার বড় প্রমাণ। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই তাহার কতকটা ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছি, এবং আবশ্যক হইলে আরও শত-সহস্র দেওয়া যাইতে পারিত, কিন্তু সে আবশ্যক আশা করি নাই। ধর্মের গোঁড়ামি কেন নারীকে হীন করিল, সে আলোচনা এ প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হইবে ; সুতরাং তাহাতে বিরত রহিলাম। শুধু এই স্থূল কথাটা বলিয়া রাখিব যে, ধর্মের বাড়াবাড়ির প্রধান উপাদান বিরক্তি—যা-কিছু সাংসারিক লোকের প্রার্থিত তাহাতেই আসক্তি নাই, এই ভাবটা দেখানো। বিষয়-আশয় টাকা-কড়ি অতি বদ জিনিস—নারীও তাই। "the devil's gate"—"নরকস্য দ্বারো নারী" এইজন্যই শ্রেষ্ঠ ধর্ম-চর্চার বীজ-মন্ত্র। অর্থাৎ, যদি পরকালের কাজ করিতে চাও ত তাহাকে নরকের দ্বারস্বরূপ জ্ঞান কর, আর যদি ইহকালের কাজ করিতে চাও ত, আমাদের দেশের যে ব্যবস্থা ছিল তাই কর। যতগুলা পারো বিবাহ কর,—তার আট-দশ রকম পথ আছে, এবং মরিলে যেমন করিয়া পারো, সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। না পারো অন্ততঃ জুজুর ভয় দেখাইয়া তাহাকে জড়ভরত করিয়া

রাখিয়া যাও। Monogamy যাহা নারীর যথার্থ সম্মানের ঠাঁই, এবং যাহা একমাত্র নর-নারীর প্রকৃত স্বাভাবিক বন্ধন, সে ধারণাই প্রায় এ-দেশে নাই। অথচ, সতীত্বের এত অপর্যাপ্ত রীতি-নীতি, এটা বজায় রাখিবার এত অদ্ভুত ফন্দি আর কোন দেশে কোনদিন উদ্ভাবিতও হয় নাই। মনে হইতেছে কোন এক মস্ত বড় লোকের লেখায় পড়িয়াছি, আমাদের দেশে সমস্ত রকম সামাজিক প্রশ্নের যে একটা বড় রকম উত্তব দিয়াছেন, তাহা এখনও জগতের সম্মুখে আছে, এবং তাহার সফলতা অনিবার্য, না, কি এমনি একটা কথা। কি জানি আমাদের উত্তর দিয়াছিল, এবং জগতের কাহারা সেজন্য হাঁ করিয়া বসিয়া আছে; কিন্তু ফল যে তাহার অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা টের পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার দেখাদেখি আরো অনেক—যাঁহারা সামাজিক ইতিহাসের কোন ধার ধারেন না, তাঁহারাও এই সমস্ত কল্পনার ধুয়া গাহিতে সুরু করিয়াছেন। "বড়-রকম উত্তর দিয়াছিল", "সমস্ত সামাজিক প্রশ্ন", "জগতের সম্মুখে আছে" ইত্যাদি বুলির অর্থ বোঝাও যেমন শক্ত, এই-সব সাহিত্যিক verbiage-এর প্রতিবাদ করিতে পারাও ততোধিক কঠিন। অন্যান্য জাতি চোখের উপর দিন দিন বড় হইয়া যাইতেছে, নর-নারী মিলিয়া পতিত সমাজটাকে দুইদিনে ঠেলিয়া উপরে তুলিয়া ধরিতেছে, যে যাহার ন্যায্য অধিকারের মধ্যে চলা-ফেরা করিয়া উন্নত হইয়া উঠিতেছে—তবুও সে-সব কিছুই নয়। আর আমাদের দেশে সেই অবোধ্য বড় উত্তরটাই মস্ত বড় এবং তাহার ভবিষ্যৎ কাল্পনিক সফলতাটাই সর্বোপরি বাঞ্ছনীয়। সেই জাতিভেদের অসংখ্য সঙ্কীর্ণতা, বালিকা-বিবাহ, বিবাহ না দিলেই জাত যাওয়া, বারো বছরের বিধবা মেয়েকে দেবী করার বাহাদুরী, পঞ্চাশ বছরের বুড়ার সহিত এগারো বছরের মেয়ের বিবাহ এবং তাহার বছর-দুই পরেই তাহার গর্ভের সন্তান—এই সমস্তই বড রকমের উত্তর। অথচ কথাটি বলিবার যো নাই। পণ্ডিতেরা হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিবেন "তুমি আমাদের মুনি-ঋষিদের চেয়ে বেশী

বোঝ ?" মনে পড়ে, সেই আম-কেনার কথা। লোকটা বলিল, "চেখে নিন—মিষ্টি গুড়।" খেয়ে দেখি তত টক আমার জীবনে খাই নাই। কিন্তু লোকটাকে কিছুতেই স্বীকার করাইতে পারিলাম না। সে ক্রমাগত চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, "টক বললেই শুনব ? আমার গাছের আম আমি জানিনে !" এর আর উত্তর কি ?

ইংরাজীতে যাহাকে ethics বলে, তাহার একটা গোড়ার কথা এই যে, বিসদৃশ হেতু না থাকিলে আমার স্বাধীনতাটি কেবল তত দূর পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইতে পারি, যতক্ষণ না তাহা আর একজনের তুল্য স্বাধীনতায় আঘাত করে। এই দুটো কথার দ্বারা মানুষের প্রায় সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে, এবং আমার বিশ্বাস, যে কোন সামাজিক প্রশ্নের স্থানও ইহারই মধ্যে সঙ্কুলান হয়। ইহাকে যে সমাজ যত বেশী অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছে, সে তত বেশী নারীর উপর অন্যায় করিয়াছে এবং তাহার প্রাপ্য অংশ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া নারীকেও নত করিয়াছে, নিজেরাও অবনত হইয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলি। একটি কন্যা হয়ত রুগ্ন, দুর্বল, অশিক্ষিত এবং অপটু, তত্রাচ একটা বিশেষ বয়সে তাহার বিবাহ দিতে হইবে, অর্থাৎ মাতৃত্বের গুরুভার তাহাকে মাথায় তুলিতেই হইবে। অথচ আর একটি বিধবা মেয়ে হয়ত সবল সুস্থ, শিক্ষিতা এবং মাতৃত্বের সম্পূর্ণ উপযোগিনী—আদর্শ জননীর সমস্ত সদ্‌গুণে হয়ত ভগবান তাহাকে ভূষিত করিয়াছেন, তবুও তাহাকে তাহার স্বাভাবিক ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। ইহাতে শাস্ত্রকারের মর্যাদা যদি-বা বজায় থাকে, ধর্মের মর্যাদা যে বজায় থাকে না, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়। প্রথমটাতেও নয়, পরেরটাতেও না।

সুসভ্য মানবের সুস্থ সংযত শুভ-বুদ্ধি যে অধিকার রমণীজাতিকে সমর্পণ করিতে বলে, তাহাই মানবের সামাজিক নীতি এবং তাহাতেই সমাজের কল্যাণ হয়—কোন-একটা জাতির ধর্ম-পুস্তকে কি আছে না আছে, তাহাতে হয় না। নারীর মূল্য বলিতে আমি এই নীতি ও

অধিকারের কথাই এতদূর পর্যন্ত বলিয়া আসিয়াছি। Supply এবং demand-এর মূল্যও বলি নাই ; কবে পুরুষ বাড়িয়া উঠিবে, কবে নারী বিরল হইবে, সে আশাও করি নাই। নারীর মূল্য নির্ভর করে পুরুষের স্নেহ, সহানুভূতি ও ন্যায়-ধর্মের উপরে। ভগবান তাহাকে দুর্বল করিয়াই গড়িয়াছেন, বলের সেই অভাবটুকু পুরুষ এই সমস্ত বৃত্তির মুখের দিকে চাহিয়াই সম্পূর্ণ করিয়া দিতে পারে, ধর্ম-পুস্তকের খুঁটিনাটি ও অবোধ্য অর্থের সাহায্যে পারে না। ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জাপান। সে কেবল তাহার নারীর স্থান উন্নত করিতে পারিয়াছে সেইদিন হইতে, যেদিন হইতে সে তাহার সামাজিক রীতি-নীতির ভাল-মন্দর বিচার ধর্মের এবং ধর্ম-ব্যবসায়ীর আঁচড়-কামড়ের বাহিরে আনিয়া ফেলিয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও সেখানে চীনাদের মত নারীর দুর্দশার সীমা-পরিসীমা ছিল না। শুধু ইউরোপ-সম্বন্ধেই The clergy have been the worst enemies of women, women are their best friends" নয়, অনেক দেশের সম্বন্ধেই ঠিক তাই। নারীর স্থান অবনত করিবার জন্য ধর্ম-ব্যবসায়ীর স্পর্ধা যে কতদূর বাড়িতে পারে, তাহা St. Ambrose-এর একটা উক্তি হইতে জানা যায়। তিনি অসংশয়ে প্রচার করিয়াছিলেন, "marriage could not have been God's original theme of creation." গড়ের অভিপ্রায়টুকু পর্যন্ত তাহাদের অগোচর থাকে না, কিন্তু কাহার সাধ্য তাহাকে অবিশ্বাস করে!

ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় একমাত্র ইসলাম-ধর্মে। যদিও নারীর স্থানটি কোরানের মতে ঠিক কোন্‌খানে, তাহা বুঝাইয়া বলা কঠিন, তথাপি মহম্মদ নারী-জাতিকে যে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, পুত্র-কন্যার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া তুলিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, বিশেষ করিয়া বিধবাকে —যাহার অবস্থা আরব ও ইহুদিদের মধ্যে সবচেয়ে শোচনীয় ও নিরুপায় ছিল—তাহাকে দয়া ও ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখিতে হুকুম করিয়া

গিয়াছেন, এ-সব কথা অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ, তদানীন্তন আরব-রমণীর ভয়ঙ্কর অবস্থার তুলনায় আরবের নব-ধর্ম যে নারীকে সহস্র-গুণে উন্নত করিয়াছে, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। Hornbeck, Ricaut প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা কি ভাবিয়া যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, মুসলমানদের মতে নারীর আত্মা নাই এবং নারীকে তাহারা পশুর মত মনে করে, তাহা বলিতে পারি না। আমি ত কোরানের কোথাও এমন কথা দেখিতে পাই নাই! বরং কোরানের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষের দিকে এই যে একটা উক্তি আছে, মৃত্যুর পর দুষ্কৃতকারীকে ঈশ্বর শাস্তি দেন—তিনি নর-নারীর প্রভেদ করেন না,—তাহা দেখিয়া মনে হয়, মহম্মদ নারীর আত্মা অস্বীকার করেন নাই। কোরানের চতুর্থ অধ্যায় এবং আরও অনেক স্থানেই নারীর প্রতি সদয় ব্যবহারের কথা ও তাহার ন্যায্য অধিকারের বিষয় এই ধর্ম-গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইয়াছে। তথাপি অনেকের বিশ্বাস, ইসলাম-ধর্মে নারীর স্থান বড় নীচে। এটা বোধ করি পুরুষের বহু-বিবাহের অনুমতি আছে বলিয়াই। চতুর্থ অধ্যায়ের গোড়াতেই আদেশ আছে, "take in marriage of such other women as please you, two or three or four and no more." এ-ছাড়া বিশ্বাসী এবং সাধু লোকেরা স্বর্গে গিয়া কিরূপ সুখ-সম্পদ আমোদ-আহ্লাদ ভোগ করিতে পাইবেন, সে-সম্বন্ধে মহম্মদ অনেক আশা দিয়া গিয়াছেন। স্বর্গে প্রতি বিশ্বাসীর নিমিত্ত কিরূপ ও কতগুলি করিয়া হুরানি নির্দিষ্ট হইবে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপ আলোচনা আছে। কিন্তু মর্ত্যের মানবীর অবস্থাটা স্বর্গে কিরূপ দাঁড়াইবে এবং সেইরূপ দাঁড়ানো বাঞ্ছনীয় কি না, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় না। Sale সাহেব তাঁহার কোরানের অনুবাদের একস্থানে লিখিয়াছেন, "but that good women will go into a seperate place of happiness, where they will enjoy all sorts of delights; but whether one of those delights will be the enjoyment of agreeable paramours created for

them. to complete the economy of the Mahamedan system, is what I have found no-where decid.ed" এই যদি হয়, এত করা সত্ত্বেও যে নারীর যথার্থ অবস্থা-সম্বন্ধে লোকের দারুন সংশয় ও মতভেদ ঘটিবে, তাহা বিচিত্র নয়। তা ছাড়া মহম্মদ নিজেও একস্থানে বলিয়াছেন, "when he took a view of paradise, he saw the majority of its inhabitants to be the poor, and when he looked down into hell, he saw the greater part of the wretches confined there to be women !"

যাঁহারা মনে করেন, সংসারে নারী প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকার জন্যই স্বভাবতঃ তাহার হীন মূল্য নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা যে সম্পূর্ণ ভুল করেন, এ-কথা বলি না। কারণ, যে-দেশেই মানুষ লড়াই করাটাই পুরুষের পরম গৌরবের বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে এবং সেই হিসাবে লড়াই করিয়াছে এবং লোকক্ষয় করিয়া বাহ্যতঃ নিজেদের নারীর অনুপাত বৃদ্ধি করিয়াছে, সেই দেশেই নারীর মূল্য হ্রাস হইয়াছে। এ-কথা সত্য হইলেও, এ-কথাটাও বুঝিয়া দেখিবার বিষয়, বাস্তবিক নারীর অনুপাত তাহাতে বৃদ্ধি হয় কি না। কারণ এই কথাটা অনেকেই গণনার মধ্যে আনেন না যে, প্রায় সমস্ত যুদ্ধপ্রিয় জাতিই নিজেদের নারীর অনুপাত বৃদ্ধি না পাইবার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। প্রধান উপায় নিজেদের শিশু-কন্যা হত্যা করিয়া। প্রায় সমস্ত আদিম অসভ্য জাতিরা শিশু-কন্যা বধ করিয়া ফেলিত। রাজপুতেরা করিত, আরব শিখেরা কন্যা জন্মিবামাত্রই গর্ত কাটিয়া পুঁতিয়া ফেলিত, কেঁধা প্রদেশের আরবেরা শিশু-কন্যার পাঁচ বৎসর বয়সে তাহাকে হত্যা করিবার পূর্বে কন্যার জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিত, "এইবার মেয়েকে গন্ধ মাখাইয়া দাও, সাজাইয়া দাও, আজ সে তার মায়ের ঘরে যাইবে।"—অর্থাৎ কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে। কোরিশের লোকেরা মক্কার নিকটবর্তী আবুদেলামা পাহাড়ে নিজেদের কন্যা বধ করিত। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো বলিয়া গিয়াছেন, "the

practice of exposing female infants and putting them to death being so common among the ancients, that it is remarked as a thing very extraordinary in the Egyptians, that they brought up all their children." "চীনাদের মধ্যে শুনিয়াছি এ-প্রথা আজও আছে। গ্রীকদের সম্বন্ধে Posidippus-এর একটা প্রচলিত উক্তি Sale উদ্ধৃত করিয়াছেন, "a man, though too poor, will not expose his son, but if he is rich, will scarce preserve his daughter."

সুতরাং লড়াই করিয়া নিজেরা মরিলে, বা কন্যা হত্যা করিলে, নারীর অনুপাত বাড়ে না, কমেও না, অনুপাতের উপর নারীর সম্মান বা অসম্মান (মূল্য) নির্ভরও করে না ; করে পুরুষের এই ধারণার উপর —নারী সম্পত্তি, নারী শুধু ভোগের বস্তু। তাই নিজেদের কন্যা বধ, তাই পরের কন্যা হরণ করিয়া আনিবার প্রথা। নিজেদের কন্যা পরে লইয়া গেলে মহা অপমান, পরের মেয়ে কাড়িয়া আনিতে পারিলে মহা-গৌরব। এইজন্যই এক পুরুষের বহু স্ত্রী সম্মান ও বলের চিহ্ন। Burck-hardt বলিয়াছেন, এই ধারণা ওয়াহাবিদের মধ্যে আজও এত প্রবল যে, তাহারা ইউরোপের এক পুরুষের একটিমাত্র স্ত্রীর কথা শুনিয়া বিস্ময়ে হাঁ করিয়া থাকে। কথাটা সত্য বলিয়া তাহারা মনের মধ্যে বিশ্বাস পর্যন্ত করিতে পারে না।

আর না। এ প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া গেল, এইবার শেষ করি। জানি না, পুরুষে এ প্রবন্ধ পড়িয়া কি মনে করিবেন, কিন্তু যাহা সত্য বলিয়া অকপটে বিশ্বাস করিয়াছি, নারীর মূল্য কেন হ্রাস পাইয়াছে এবং বাস্তবিক পাইয়াছে কি না, এবং মূল্য হ্রাস পাইলে সমাজে কি অমঙ্গল প্রবেশ করে, এবং নারীর উপর পুরুষের কাল্পনিক অধিকারের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিলে কি অনিষ্ট ঘটে, তাহা নিজের কথায় ও পরের কথায় বলিবার চেষ্টা করিয়াছি—এইমাত্র। তাহাতে শাস্ত্রের অসম্মান করা হইয়াছে, কি হয় নাই, দেশাচারের উপর কটাক্ষ করা হইয়াছে, কি হয় নাই—এ-কথা মনে করিয়া কোথাও থামিয়া যাইতে পারি নাই।

যাহা সত্য তাহাই বলিব এবং বলিয়াছিও, অবশ্য ফলাফলের বিচার-ভার পাঠকের উপর।

নর-নারীর পবিত্র বন্ধনের সীমা ও পরিণতি সম্ভবতঃ একদিন কি হইবে এবং কি হওয়া উচিত, উপসংহারে শুধু সেই কথাটাই হারবার্ট স্পেন্সরের ভাষায় ব্যক্ত করিব।—"As monogamy is likely to be raised in character by public sentiment requiring that the legal bond shall not be entered into unless it represents the natural bond; so, perhaps it may be, that maintenance of legal bond will come to be held improper if the natural bond ceases. Already increased, facilities for divorce point to the probability that whereas, while permanent monogamy was being evolved, the union by law (originally the act of purchase) was regarded as the essential part of marriage and the union by affection as non-essential, and where as at present the union by law is thought the more important, and the union by affection the less important, there will come a time when the union by affection will be held of primary moment and the union by law as of secondary moment; whence reprobation of marital relations in which the union by affection has dissolved. That this conclusion will be at present unacceptable is likely—I may say, certain········Those higher sentiment accompanying union of the sexes, which do not exist among primitive men, and were less developed in early European times than now, may be expected to develop still more as decline of militancy and growth of industrialism foster altruism; for sympathy which in the root of altruism is a chief element in these sentiments.